বিজ্ঞান কথন

Indian Science News Association ESTD.–1935

কলকাতা, ডিসেম্বর ১১, ২০২৫ বৃহস্পতিবার, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

তাণ্ডব

ইংরেজিতে একটি শব্দ রয়েছে Impunity. এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ থাকলেও দ্যোতনাটি বোধহয় ধারে কাছে আসে না। আর এই Impunity-iB কুৎসিত প্রতিফলন দেখা গেল বিগত কালীপুজোর রাত থেকে পরের অন্ত ত চার রাত্রি পর্যন্ত। এর পরেও রয়েছে ছটপুজো জগদ্ধাত্রীপুজো, এবং কার্তিকপুজো। অন্তিমে রয়েছে বর্ষ বরণ।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের বোধগম্য হয়েছে আমরা কিসের কথা বলতে চাইছি। উৎসবমুখর পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের কোনও ঘাটতি নেই। সবাই জানেন এখানে উৎসব পালনে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রকাশ্যে অনুদানও দেওয়া হয়। সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ, কিছু বললেই রাজনীতি এসে যাবে। আর রাজনীতি আমাদের আলোচ্যও নয়। কিন্তু প্রত্যয়েরও তো বাত্যয় আছে। আপনাদের স্মরণ করাই, যখন আমরা আমাদের এই পত্রিকা শুরু করি তখন আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে আমাদের সম্পাদকীয় নীতিতে কোনও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটবে না। আমরা সেই নীতির প্রতিই বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি, করে আসছি। কিন্তু আর বোধহয় চুপ করে থাকা গেল না। এই কথাটা সবারই জানা সংবাদপত্র সমাজেরই দর্পন। সেই সমাজে শুধু যদি রাজনৈতিক শক্তিরই একাধিপত্য এবং প্রাবল্য ঘটতে থাকে তাহলে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ কথাটা আমরা বলতে বাধ্য হলাম ঐ চার রাত্রি ধরে শব্দাসুরের পাশবিক এবং ন্যক্কারজনক আস্ফালন দেখে। যে বিষবাষ্পের অসহনীয় পরিণতি শহর কলকাতায় এবং আশেপাশে বিকট শব্দবাজির বিস্ফোরণের পর ছড়িয়ে পড়ল তার দায় কে নেবে? শুধু কি ৬৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করে আর ১১০০০ কিলোগ্রাম অবৈধ বাজি আটক করলেই কর্তব্য সম্পাদন হয়ে যায়?

পরিবেশবাদীরাও তাঁদের বিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিপদের শঙ্খ ঘন্টা বাজাচ্ছিলেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও বারংবার সতর্কবার্তা শোনাচ্ছিলেন, আর ঘরে ঘরে বয়স্করা আতঙ্কে বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন। এসব সত্ত্বেও কি আমাদের হুঁশ ফিরেছে? কিসের জন্য এত মদমত্ত উল্লাস? ধৃতরাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ছাড়া কি এ রকম নারকীয় ক্রিয়াকলাপ সম্ভব?

ফলত, কি দেখা গিয়েছে? বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিই পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল বাতাসে দূষিত রাসায়নিক পদার্থের পরিমান ৪০ থেকে ১৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। ফলে, হাসপাতালে বহির্বিভাগের রোগী ভর্তির সংখ্যাটাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশে। এঁরা কেউ শ্বাসকষ্ট, অন্ধত্ব, বা হৃদরোগে আক্রান্ত। আর একটি কাগজ বলেছে, গত ১৫ বছরে ১১৬ জনের এসব কারণেই মৃত্যুও হয়েছে। অভিজ্ঞরা বলছেন এ সবই আতশবাজির পরিণতি।

গত কয়েক বছর ধরে আবার "গ্রীন ক্র্যাকার"-এর কথা শোনা যাচ্ছে। সেটি যে কি বস্তু, খায় না মাথায় দেয়, তা আজ অবধি বোঝা গেল না। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলছেন ক্ষতিকারক রাসায়নিকের পরিমান এর মধ্যেও কম নয়। তাছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীরা যে সবুজ মোড়কের আড়ালে, আবডালে নিষিদ্ধ বাজিই বিক্রি করছেন তার প্রমাণ তো পুলিশের কর্তারাই পেয়েছেন। তবুও হুঁশ ফেরে নাই।

আর একটি প্রশ্নও পাশাপাশি ওঠে। কেন আজকাল সরকারি, অসরকারি এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও রাজনীতির রং লেগে যায়? পরিবেশ সংক্রান্ত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট একটি পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান। হঠাৎ তাদের কি প্রয়োজন ছিল যে তারা শব্দবাজির পরিমাপের মাত্রা ৯০ ডেসিবেল থেকে ১২৫ ডেসিবেল অবধি বাড়িয়ে দিলেন? তারা কি জানতেন না কোন, কোন রাজ্যে এই দানব শক্তির অপব্যবহার হতে পারে? সব দেখে শুনে মনে হয় আমাদের প্রশাসকেরা বোধহয় ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের অমর সৃষ্টি কপালকুন্ডলার সেই লাইনটি কোনদিনও পড়ে দেখেননি। "তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"

নাহলে এত কাণ্ডের পরও তাঁরা কোন মুখে বলেন, অন্য রাজ্যের তুলনায় "আমাদের পরিস্থিতি যথেষ্ট ভাল?" একেই কি আত্মশ্লাঘা বলে?

দুই বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর জন্মশতবর্ষ

শ্যামল চক্রবর্তী

বিজ্ঞান সংস্কৃতির দৈন্যদশা বাড়ছে বই কমছে না। নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী আমন্ত্রণের ঢক্কানিনাদ বিজ্ঞাপন মাঝে মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অথচ এই মহানগর কলকাতায় নিঃশব্দে ও উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে ভারতের দুই সেরা বিজ্ঞানীর জন্মের এক'শ বছর। তাঁরা বিজ্ঞান জগতে যে অবদান রেখেছিলেন, সামাজিক যে ভাবনা লালন পালন করেছিলেন, তা যদি নবীন প্রজন্মের কাছে না পৌঁছয়, বিজ্ঞান সংস্কৃতি গড়ে উঠবার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে না।

যে দুজন বিজ্ঞানীর কথা বলতে চাইছি আমরা, তাঁদের নাম রাজা রামান্না ও এম এস স্বামীনাথন।

দুজনেরই জন্ম দক্ষিণ ভারতে। ১৯২৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি রাজা রামান্না ও ৭ই আগস্ট এম এস স্বামীনাথন জন্মগ্রহণ করেন।

কর্ণাটকের টুমকুর জেলার তিপতুর-এ রামান্নার জন্ম। বাবা বিচার বিভাগে কাজ করতেন। বেঙ্গালুরুর বিখ্যাত বিশপ কটন বয়েজ স্কুলে পড়েছেন প্রথমে। স্কুলে পিয়ানো বাজাতে শিখেছেন। আইনস্টাইন ও সত্যেন্দ্রনাথের মতোই পদার্থবিদ্যার পাশাপাশি সঙ্গীত ছিল রামান্নার আজীবনের সঙ্গী।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে রামান্না মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভরতি হন। এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, কে এস কৃষ্ণাণ, ও ই সি জি সুদর্শন। কলেজে রামান্না পদার্থবিদ্যার স্নাতক ডিগ্রির পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিএ ডিগ্রি নিয়েছেন। একইভাবে দুই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও নিয়েছেন। এমন ছাত্র কি আমাদের খুব বেশি চোখে পড়ে?

লন্ডনের কিংস কলেজে গবেষণায় যোগ দেন রামান্না। যে অধ্যাপকের কাছে কাজ করেছেন তাঁর নাম সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি অ্যালান মে। নোবেলজয়ী পদার্থবিদ স্যাডউইক পরমাণু গবেষণায় অ্যালান মে-কে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পরমাণু বোমার যে সর্বনাশা পরিণাম তা গোপন রাখতে রাজি নন তিনি। তাঁর অভিমত, বিপদের কথা বলে দেওয়া হোক সবাইকে। তবেই এই বোমা মানুষ খুনে কাজে লাগাতে চাইবে না কেউ। শাসকেরা কি সেই কথা মানে? সোজা ছ'বছর কারাবন্দী থাকতে হল তাঁকে।

ওই সময়েই রামান্না তাঁর গবেষণার কাজ করেন। বিজ্ঞানী জে ডি বার্নাল বলেছিলেন, গোপন খবর সবাইকে জানিয়ে ভুল কিছু করেননি অ্যালান। বিজ্ঞানের অপব্যবহারের সম্ভাবনা দেখে তিনি চুপ থাকবেন কেমন করে?

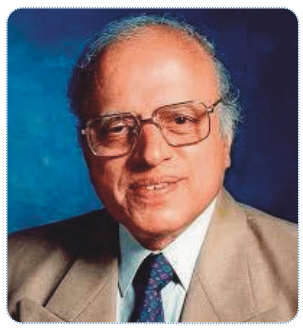

যাইহোক দেশে ফিরে প্রথমে টি আই এফ আর, ও তারপর ১৯৫২ সালে রামান্না ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে ভারতের প্রথম নিউক্লিয় চুল্লি 'অপ্সরা' তৈরি হয়। ওদিকে সঙ্গীতচর্চা থেকেও কখনও বিরত থাকেননি। তাঁর মাথা থেকেই ভাবনা এসেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের এনে ভাবা পরমাণু কেন্দ্রেই তাদের অনুশীলন দেওয়া হবে। তারপর এরা সামর্থ্য অনুযায়ী পরমাণু গবেষণা করবেন।

এটি খুব বড়ো কাজ। ভারতের পরমাণু গবেষণার দুই অগ্রণী অভিভাবক হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ও মেঘনাদ সাহাকে এমন কি বিক্রম সারাভাইকেও চিরকালের মতো স্বল্প ব্যবধানে হারিয়ে গবেষণায় যে স্থবিরতা আসার কথা ছিল, বলতে অবশ্যই ভালো লাগে, সেই স্থবিরতা আসেনি। প্রশিক্ষিত তরুণ বিজ্ঞানীরা সেই হাল ধরেছেন।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত ১৯৭৪ সালে পরমাণু বোমার পরীক্ষা করতে সমর্থ হয়। বিস্তারিত বিবরণে আমরা যাব না। অনেক ধাপ, অনেক পছন্দ-অপছন্দের বাধা পেরিয়ে ১৯৮৩-৮৭ রামান্না ভারতের পরমাণু

>>২

ষ্টেম সেল থেরাপি

কোমরে ব্যথা এবারে কমবে

প্রশান্ত কুমার বসু

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল। বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন অথচ উঠতে পারছেন না। সারা শরীর আড়ষ্ট। তার ওপর কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা। এ যে কি কষ্ট কাউকে বোঝান যায় না।

আপনি যে কাউকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন, ঠিক একই রকম উত্তর পাবেন। কারণ, ভারতবর্ষের প্রায় ৮০ শতাংশ লোকই এ রকম অসুস্থতায় আক্রান্ত। বয়স্করা তো আছেনই, আজকাল তরুণ তরুণীরাও এই অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছেন। নানারকম চিকিৎসা করিয়ে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, ক্লান্ত। অথচ কোমরে ব্যথা বেড়েই চলেছে।

কথাগুলো বলছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ ভেঙ্কটেশ মোভা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই চিকিৎসকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিগ্রী রয়েছে। বসেন মুম্বাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর এবং হায়দ্রাবাদে। সর্বোপরি আমেরিকার ডালাসে। একটি আলোচনা সভায় ডেকেছিলেন। ঐ ৮০ শতাংশের মধ্যে আমিও আছি কি না, তাই আমারও যোগ দেওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। তবে কথা বলার সময় ছিল বড়ই কম।

কোমরের ব্যথা নানা কারণে হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম "ডিস্ক প্রোল্যাপ্স!" সাধারণত মেরুদন্ডের হাড়গুলোর মাঝখানে একটা জেলির মত বস্তু থাকে, যা খুবই নরম এবং কোমর এবং পিঠের নড়াচড়ায় সাহায্য করে থাকে। এগুলো অনেকটা "শক অ্যাবজর্বার"-এর কাজ করে, জানালেন ডাঃ মোভা।

অনেক সময় চোট, আঘাত, হাড়ের ক্ষয় বা অন্যান্য অসুবিধায় এই জেলগুলোর বাইরের দেওয়ালটা ফেটে যায় এবং জেলির বাইরের আস্তরণের আকৃতিটা পাল্টে যায়। পরিণতিতে মেরুদণ্ডের পেশীগুলোর ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। সূত্রপাত হয় অসহনীয় ব্যথার, যে ব্যথা রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এই চাপের ফলে অনেক সময় সায়াটিক নার্ভও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আর সে ব্যথার কথা? কল্পনা করা যায় না।

এই অবস্থায় রোগীরা প্রথমেই মুঠো মুঠো ব্যথা কমার ওষুধ খেতে আরম্ভ করেন যেগুলো দোকানে সহজেই কিনতে পাওয়া যায়। সবটাই সাময়িক উপশমের জন্য। পাশাপাশি চলতে থাকে সেঁক, লাগানো হয় নানা ধরনের মলম। ব্যথার নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। ওষুধেরও রকমফের আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টেরয়েডেরও ব্যবহার হয়। কেউ খেয়ালই রাখেন না যে এর কত রকমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে।

যখন এ সবে কাজ হয় না তখন সবাই দৌড়োন হাড়ের ডাক্তারের

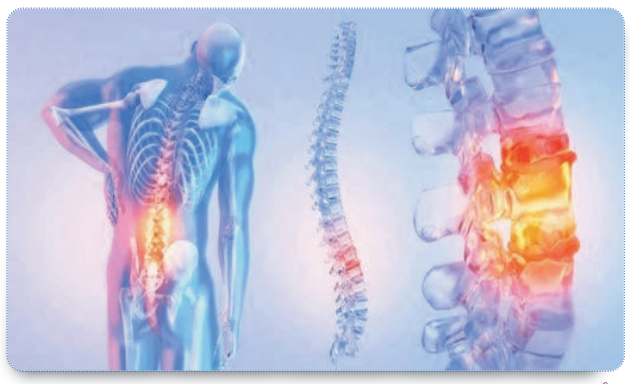

>>২

INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION (ISNA)
92, A.P.C. Road, Kolkata – 700009

cordially invite you to the
Formal Launch of 'Radio Kolkata' and ISNA Tie-up
and
Release of Bengali e-paper 'Bigyan Kahon', Vol. 4, Issue 2

As Part Of The XXXVIII Training Programme on Science Communication and Media Practice 2025-2026
to be held on
December 11, 2025 (Thursday) at 4.30 p.m.

in the
N.R. Sen Auditorium
Rashbehari Siksha Prangan, Rajabazar, University of Calcutta
92, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009

Dr. Rajyasri Neogy
Principal, Vijaygarh Jyotish Ray College
will grace the occasion as the Chief Guest

Mr. Bikas Das
Veteran Photojournalist, Associated Press (AP) Eastern India
will serve as the Guest of Honour

Professor Bikas K. Chakrabarti
President, ISNA
Former Director, Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata
will preside over the programme

Dr. Amit Krishna De — Convener
Shri Prasanta K. Bose — Chairman
XXXVIII Training Programme on Science Communication and Media Practice (TPSCMP) 2025-2026
and
Honorary Secretary, ISNA
and
Vice-President, ISNA

Place: Kolkata
Dated: 03/12/2025

উন্নয়ন ও ভারসাম্য: প্রকৃতি শোধ নিচ্ছে

দেবদূত ঘোষঠাকুর

উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ, দার্জিলিং পাহাড়, সিকিম কিংবা কাশ্মীরের অনন্ত নাগ যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দেরাদুন, জম্মু আর ডুয়ার্স যেন ভাই ভাই।

প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে উন্নয়নের জোয়ার নিয়ে এলে কি হয় তা গত তিন মাসের মধ্যে বুঝিয়ে দিল হিমালয়ের তিন এলাকা উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর আর দার্জিলিং। প্রকৃতির রুদ্র-রোষের ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা জুড়ে দিয়েছে হিমালয়ের তিন ভৌগোলিক এলাকাকে। উত্তর প্রান্তের কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ আর পূর্বের দার্জিলিং।

এদিকে সিকিমে যে হারে হিমবাহ কমছে আর মেঘ ভেঙে মাঝে মাঝেই প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে তাতে যে জলধারা প্রচন্ড গতিতে নীচের থেকে ধেয়ে আসছে তার বহন করার ক্ষমতা হারিয়েছে পাহাড়ি নদীগুলি। ফলে সেই প্রচন্ড শক্তিশালী প্রবাহ মানছে না কোনও বাধাই। ধ্বংসলীলা চালাতে চালাতে সেই জলরাশি সমতলে নেমে এসে প্লাবন ঘটাচ্ছে।

ধ্বস নামছে পাহাড়ের এখানে সেখানে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে জনপদ। কোথাও বা জনপদ গ্রাস করে গতিপথ বদলে ফেলছে নদী। এ বছরে ঘটনাগুলি বার বার করে ঘটেছে। হঠাৎ করেই ধস নেমে বড় বড় ফাটল ধরে যচ্ছে শহরের বাড়িগুলিতে। বসে যাচ্ছে রাস্তা। প্রাণ বাঁচাতে মানুষ নেমে আসছেন রাস্তায়। ছবির মতো পাহাড়ি জনপদ ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিচ্ছে।

একই ভাবে কয়েক বছর আগে সিকিমের লাচেনের লোনক লেকের দেওয়াল গিয়েছিল ফেটে। সেই জলরাশি গিয়ে পড়েছিল তিস্তায়। আর তিস্তা সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক, সেনা ছাউনি, জন বসতির উপরে ধ্বংস লীলা চালিয়েছিল। হড়পা বানে কত মানুষ যে ভেসে গিয়েছিল তার হিসেব কষার মতো অবস্থায় ছিলনা প্রশাসন।

এবারেও অবস্থাটা অনেকটা তাই। কোনও লেকের দেওয়াল হয়তো ভাঙেনি, কিন্তু অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নেমে গোটা একটা এলাকাই

>>২

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তি

মহুয়া সেনগুপ্ত

ন্যানোপ্রযুক্তি হলো পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে (অতি ক্ষুদ্র পরিসরে) পদার্থকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান। "ন্যানো" শব্দটি গ্রিক "nanos" থেকে এসেছে, যার অর্থ বামন বা অতি ক্ষুদ্র। ১ মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ হলো ১ ন্যানোমিটার (১ হস = ১০⁻⁹ স)। এই ক্ষুদ্র পরিসরে পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্নভাবে কাজ করে, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

ন্যানোমেডিসিন হলো ন্যানোপ্রযুক্তির সেই শাখা যা স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসার উন্নতির জন্য ন্যানো উপকরণ এবং ডিভাইস ব্যবহার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তি (Nanotechnolo) এক বিশাল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, যা রোগ নির্ণয় (diagnosis), চিকিৎসা (treatment) এবং প্রতিরোধে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

ন্যানোস্কেলে (১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার) পদার্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে উদ্ভাবনী ও সম্ভাবনাময় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি করা হচ্ছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানোপ্রযুক্তির প্রধান প্রয়োগগুলি হলো:

১. লক্ষ্যবস্তুভিত্তিক ওষুধ সরবরাহ (Targeted Drug Deliver): চিকিৎসা বিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হলো লক্ষ্যবস্তুভিত্তিক ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রচলিত ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রে ওষুধ শরীরের সুস্থ কোষগুলোকেও প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

ন্যানোপার্টিকেল ব্যবহার করে ওষুধকে সরাসরি আক্রান্ত কোষ বা টিস্যুতে (যেমন, ক্যান্সার আক্রান্ত স্থানে) পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এতে ওষুধের কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায় এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমে যায়। ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপির ওষুধ ন্যানো পার্টিকেলের ভেতরে ভরে টিউমার কোষে প্রবেশ করানো হয়, যা সুস্থ কোষের ক্ষতি কমায়।

২. উন্নত রোগ নির্ণয় ও ইমেজিং (Advanced Diagnostics and Imaging): ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত এবং নির্ভুল করা সম্ভব হয়েছে।

বায়োসেন্সর: ন্যানোসেন্সর এবং ন্যানোবায়োসেন্সর ব্যবহার করে রক্ত বা শরীরের অন্যান্য তরল থেকে রোগের সূচক বা মার্কার (markers) খুব দ্রুত এবং সূক্ষ্মভাবে শনাক্ত করা যায়।

ইমেজিং: ন্যানো পার্টিকেলগুলো ইমেজিং-এর সময় কনট্রাস্ট এজেন্ট (contrast agent) হিসেবে কাজ করে। এর ফলে এমআরআই (MRI) বা অন্যান্য ইমেজিং পদ্ধতিতে শরীরের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম কাঠামো বা রোগাক্রান্ত স্থান আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

৩. টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ও পুনর্জন্মমূলক ওষুধ (Tissue

>>৩

ইমিউনিটি-র ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরী

পরিতোষ ভট্টাচার্য

ইমিউনিটি (Immunity) হল প্রকৃতি প্রদত্ত এমন এক ধরণের শারীরিক ক্ষমতা যা বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরকে লড়াই করতে এবং সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। এর বাংলা প্রতিশব্দ হল রোগ - প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা। ইমিউনিটি নানা রকমের হতে পারে। যেমন - সহজাত, অভিযোজিত, সক্রিয়, প্যাসিভ ইত্যাদি।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ইমিউনিটি বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত। আনুমানিক ৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে যখন প্লেগ মহামারী হয়, তখনই দেখা যায় একবার যারা প্লেগ আক্রান্ত হয়েছে, তাদের বিপদ তুলনামূলক ভাবে কম। পরবর্তী কালে এই বিষয় নিয়ে নানা গবেষণা হয়। ব্রিটিশ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার-কে ইমিউনিটি গবেষণার জনক বলা হয়। এর পর লুই পাস্তর-এর গবেষণা, এমিল ভন বেহরিং, শিবাসাবুরো কিতাস্টো, এলি মেটনিকোফ, পল এহরনিচ প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানী ইমিউনিটি বিষয়ের উপর অনেক গবেষণা করেছেন।

আমরা জানি শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া মানুষের শরীরে উপস্থিত থাকা কিছু উপকারী জীবাণু, বিশেষ করে অন্ত্রের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া, একটিনোমাইসিটিস রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থেকে শরীরকে বাঁচায়। সেই প্রেক্ষিতে আমরা এ্যান্টিজেন - এ্যান্টিবডি বিষয় নিয়েও পরিচিত হই। এলি মেটনিকফ-এর গবেষণার মাধ্যমে ফ্যাগোসাইটোসিস নামের রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার কথা জানতে পারি। মেটনিকফ ছিলেন father of cellular Immunity.

বিগত ২০১৯ সালের শেষ দিকে যখন সারা বিশ্বে কোভিড ১৯-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন ডাক্তার, বিজ্ঞানী, প্রশাসক - সকলের পক্ষ থেকে ইমিউনিটি বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। শরীরের ইমিউন সিস্টেম বাড়ানোর জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার, হলুদ, রসুন, তাজা ফল, শাক সবজি, মধু - লেবুর মিশ্রণ ইত্যাদি খাবার পেতে ঘরে ঘরে নানা উদ্যোগ তৈরী হয়েছিল।

এ ছাড়া শরীরের অস্থিমজ্জায় তৈরী হওয়া থাইমাস লিম্ফোসাইট বা টি - কোষ নামের একধরনের শ্বেত কণিকা (Tregs) দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। টি-কোষ শরীরকে বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, ক্যান্সার কোষকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এদের প্রধান কাজ হল শরীরের নিজস্ব কোষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা (যেমন - অটো ইমিউনিটি প্রতিরোধ, অতিরিক্ত প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)।

এবছর (২০২৫) নোবেল কমিটি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে তিনজনকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে। এরা হলেন - মেরি ই. ব্রুনকো এবং ফ্রেড রামসডেল (আমেরিকা) ও শিমন শাগাকুচি (জাপান)। তাঁদের গবেষণা ছিল ইমিউনিটি নিয়ে, বিশেষ করে টি-কোষ যা ইমিউন সিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং নিজস্ব কোষ আক্রমণ করা প্রতিরোধ করে। আগামী দিনে এই গবেষণা ইমিউনোলজির ক্ষেত্র আরও সমৃদ্ধ করবে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ, জাতীয় জৈব সার উন্নয়ন কেন্দ্র

ষ্টেম সেল থেরাপি

কোমরে ব্যথা এবারে কমবে

প্রশান্ত কুমার বসু

পাতা ১ এর পর>>

কাছে। প্রথমেই এক্সরে করা হয়। অবশ্য এর থেকে অনেক আধুনিক পদ্ধতি হল এমআরআই। শল্য চিকিৎসা যাঁরা করেন সেই সমস্ত বিশেষজ্ঞরা তখন দেখেন যে ডিস্কের কতটা ক্ষতি হয়েছে বা কতটা বেরিয়ে এসেছে। সেই বুঝে তাঁরা নিদান দেন ডিস্কেকটমি করতে হবে। অর্থাৎ, অবস্থা বুঝে ডিস্কের যে অংশটি বেরিয়ে এসেছে হার্নিয়েটেড ডিস্ক সেটিকে অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হবে। সেই জায়গায় পরে ছোট ছোট স্টিলের পাত লাগানো হয়। ব্যথা হয়তো কমে কিন্তু আক্রান্ত জায়গাটা শক্ত হয়ে যায়।

এখানেই আমাদের পদ্ধতির সার্থকতা, দাবী করলেন ড: মোভা। "আমরা প্রথমেই ডিস্কের উচ্চতাটা মেপে দেখি। তাতে কতটা পরিমান কোষের ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাপ করা যায়। এবারে আসল কাজ শুরু। কোমর ব্যথায় আক্রান্ত রোগীকে নানা রকম পরীক্ষার পর অ্যানাস্থেশিয়ার সাহায্যে অজ্ঞান করিয়ে প্রথমে তার শরীর থেকে হাড়ের মজ্জা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। তার থেকে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম ভাবে কোষ সৃষ্টি করা হয়।"

এবার রোগীও প্রস্তুত, ওঁরাও প্রস্তুত। ঐ কৃত্রিম কোষগুলো যাদের ষ্টেম সেল বলা হয় - ইঞ্জেকশনের সাহায্যে আক্রান্ত ডিস্কের জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ওই একটি ইঞ্জেকশনেই কাজ হয়ে যায়, জানালেন ডঃ মোভা। আস্তে আস্তে নতুন কোষ তৈরী হওয়ার ফলে ডিস্কটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। ব্যথার কোন চিহ্নই থাকে না।

এই পদ্ধতির আর একটি সুবিধেও আছে। ডিস্কটির মধ্যে জলীয় অবস্থাটিও ফিরে আসে। ফলে কোমর নড়াচড়া করলে ডিস্কটিও সে রকম আকৃতিই নিয়ে নেয়। তবে যারা খেলাধুলা করেন তারা অনেক সময়ই আর একটি ইঞ্জেকশন নিয়ে নেন। অবস্থা বুঝে পরের বছর হয়তো আর একটি। ইঞ্জেকশন নিয়ে ব্যথা হলে আমরা ব্যথা কমানোর জন্য একটু খাওয়ার ওষুধ দিয়ে থাকি। ফিজিওথেরাপিও চালু করাই। সব মিলিয়ে রোগী খুব তাড়াতাড়িই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন, তিনি বললেন।

সবই তো বুঝলাম কিন্তু খরচ?

আপনি আপনার রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিন। আমরা সেটা দেখে আপনাকে খরচের কথা জানিয়ে দেব, বলে ওঁর সহকারিনী ডঃ মৈত্রেয়ী শাহ আশ্বস্ত করলেন।

আমার এই আশ্বাসের পরেও যেন ভয় কাটল না। কারন, গুগল চাচা ইঙ্গিত দিচ্ছেন ভারতবর্ষে ষ্টেম সেল থেরাপির খরচ ৫ লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

অতএব, রিপোর্ট পাঠানোও হয়নি, ব্যথাও কমেনি। কি করে কমবে? খরচার ভয়টিই যে আমার কমেনি!

সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন

উন্নয়ন ও ভারসাম্য: প্রকৃতি শোধ নিচ্ছে

দেবদূত ঘোষঠাকুর

পাতা ১ এর পর>>

জাতীয় সড়ককে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিস্তা বা তোর্সায়। জলরাশি প্রবল বেগে এসে ভাসিয়ে দিয়েছে গোটা ডুয়ার্সকে। এটা যেন ভবিতব্যই ছিল। বহুধাবিভক্ত তিস্তার জল ধারণ ক্ষমতা এখন তলানিতে। সেই ১৯৬৮ সালের লক্ষ্মী পুজোর রাতের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসছে জলপাইগুড়ির প্রবীণদের আলোচনায়।

উত্তরাখন্ড এবং হিমাচল প্রদেশের বিপদটা ছিল ওই এলাকা কেন্দ্রিক। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিপদটা শুধু নির্দিষ্ট কোনও এলাকার নয়, বিপদ সমগ্র জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার। সংলগ্ন বাংলাদেশেরও।

উত্তরাখণ্ড আর উত্তরবঙ্গের এই সঙ্কটের মূল কারণ হল ওই এলাকার সব নদীর বহমানতা বাধাপ্রাপ্ত হওয় এবং তাদের ভৌগোলিক অবস্থান। উত্তরাখণ্ডের ক্ষেত্রে অলকানন্দা আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তিস্তা কিন্তু যখন তখন, যা খুশি ঘটিয়ে দিতে পারে, এমনই বলছেন পরিবেশবিদদের অনেকেই।

শুরু করা যাক উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ দিয়ে। অলকানন্দার তীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬১৫০ ফুট উপরে গাড়োয়াল হিমালয়ের ধস-প্রবণ এলাকায় মাথা তুলেছে ছবির মতো শহর জোশীমঠ। দু বছর আগে ২ জানুয়ারি রাতে শহরের ৫৫৯টি বাড়িতে ফাটল দেখা যায়। ফাটল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়তে থাকে। মানুষ ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ক্রমশ আরও নানা জায়গায় ফাটল দেখা দিতে থাকে। একসময় বোঝা যায়, গোটা শহরই ধীরে ধীরে ধসে পড়ছে।

আর এই ঘটনার পরে পরেই শুরু হয়ে যায় বিশেষজ্ঞদের হরেক রকম বিশ্লেষণ। সব মতামতকে সংক্ষিপ্ত করে আনলে দেখা যাচ্ছে মূল কারণগুলি হল, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, কেদারনাথ-বদ্রীনাথ রেললাইন প্রকল্প এবং এনটিপিসি-র তপোবন-বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট করেই তৈরি হয়েছে এসব।

বছর দু'য়েক আগেই সেখানে ঘটে গিয়েছে আর একটি বিপর্যয়। বিগত ২০২১ সালে চামোলি জেলায় নন্দাদেবী হিমবাহের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। হড়পা বানে ভেসে যায় ঋষিগঙ্গা ও ধৌলিগঙ্গা নদী। অন্তত ৩১ জন মারা যান। নিখোঁজ হন ১৬৫ জন। তবুও 'অবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন' থেমে থাকেনি।

জোশীমঠে যে ঘনঘন ধস নামে তা কারও অজানা নয়। কেন ধস নামে তা জানতে ১৯৭৬ সালে তৈরি হয়েছিল এক কমিটি। সেনাবাহিনী, আই-টিবিপি, বিআরও, শ্রী কেদারনাথ-বদ্রীনাথ মন্দির কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ছিলেন সেই কমিটিতে। তার রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, ব্যাপক নগরায়নের চাপে জোশীমঠ হয়তো একদিন ধসে পড়বে। সেটাই হয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটাই শুরু।

তাঁদের ব্যাখ্যা, জোশীমঠ এলাকায় মাটি দুর্বল। হিমালয়ের ধস যে মাটি বয়ে আনে, তা দিয়েই ওই এলাকা গঠিত। গত কয়েক দশক ধরে সেখানে কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই চলছে নির্মাণ। তার ওপরে বাড়ছে জনসংখ্যার চাপ। পর্যটনের জন্য বিশাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। অলকানন্দা নদীর স্রোত আটকে দেওয়া হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। বিপর্যয় ঠেকাবে কে?

জোশীমঠের সঙ্গে বড় মিল আমাদের সিকিম ও দার্জিলিং পাহাড়ের। এখানেও পাহাড়ে পাথরের চাইতে মাটি অনেক বেশি। জল যখন পাহাড় বেয়ে নীচে নামে, স্বাভাবিক খাতে বা ঢালে, তখন জলের সঙ্গে সঙ্গে নামে পাহাড়ের মাটিও। পাহাড় থেকে মাটি অত খসে যায় বলেই এদিকের পাহাড়ে এত ধস নামে। ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে চলেছে মাটি। লোকেন লেকে এমনিই হয়েছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের অনেকেই বলেছেন আশপাশের মাটি হয়তো আগে থেকেই সরে যাচ্ছিল। লেকে জলের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়েছে। এই ধরনের পাহাড়ে নির্মাণ কাজ যে শর্ত মেনে করা উচিত তাও হচ্ছেনা। এ ব্যাপারে উত্তরাখন্ড, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ একই দড়িতে বাঁধা। তাই এক জায়গায় ধস নামার পরে তার যে কতদূর ছড়িয়ে পড়বে তার কেউ জানেনা। একদিকে ধস,অন্যদিকে তিস্তার ভয়াল অবস্থা ইঙ্গিত দিচ্ছে বিপর্যয়ের।

ধস মত বেশি নামে ততোই মাটি নেমে আসে নদীর স্রোত বেয়ে। আর সেই মাটি - জল গোলা মাটি - যে কোনও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইনের ঘূর্ণন যে থামিয়ে দিতে পারে, তা জানা গিয়েছিল ১৯৬৭ সালেই, যখন সবে উৎপাদন শুরু করা জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের টারবাইন থেমে গেল তখনই। কিন্তু তা থেকে কেউ শিক্ষা নেয়নি।

জলঢাকার এই অভিজ্ঞতার ফলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি নদী সম্পর্কে সবাই একটু অনিশ্চিত হয়ে যায়। এরা ঠিক চেনা নদী নয়। এদের স্বভাবও সবসময় বইপড়া নদীবিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। এইসব নদীর ধর্ম পাকাপাকি যতদিন জানা না যায়, ততদিন নদীগুলো নদীর মতই থাকুক, নদীর গায়ে হাত দেয়ার দরকার নেই।

তিস্তা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত' বইটি থেকে কথা ধার করতেই হবে। দেবেশবাবু লিখেছেন, '১৯৬৮ সালে তিস্তার বড় বন্যার পর, ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় তিস্তা প্রকল্প কথাটা প্রথম খবরের কাগজের পাতায় আসে। তিস্তা-মহানন্দা মাস্টার প্ল্যানটিও সেই সময়ের। নীচে তিস্তার জলকে এক জায়গায় আটকে, তিস্তাকে একটা মূলখাতে বইয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়।'

দেবেশ বাবু লিখেছিলেন, তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এ বৃত্তান্তের তিস্তা ইতিহাস হয়ে গেলো। এখন আর তিস্তা সেই পুরনো তিস্তা থাকলো না। এখন প্রকৃতির সেই নদীর পুনর্জন্ম ঘটবে মানুষের হাতে। হিমালয়ের তুষারগলা জল আর মৌসুমি মেঘের বৃষ্টিধারায় তিস্তার জল যতই বেড়ে উঠুক, তা বয়ে যাবে মানুষের নির্দেশিত খাতে, নির্দেশিত গতিতে। তখন চর জেগে উঠবে মানুষের ইচ্ছায়।

তিস্তা ব্যারেজ আরও কয়েক বছর পর হয়তো শেষ হবে। তখন সেই নতুন মানুষের তৈরি নদীর সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতি একেবারে আমুল বদলে যাবে। কত দ্রুত আর কতটাই আমুল যে তা বদলায়, তা বদলানোর আগে আমরা ধারণাও করতে পারি না, বদলানোর পরও মাপতে পারি না।'

পাহাড়ী নদীগুলি যে রহস্যময়ী তা জেনেও আমরা বার বার তাদের স্বাভাবিক গতিকে বন্ধ করতে চেয়েছি। পাহাড়ের ভঙ্গুর জমিতে অবাধে নির্মাণ কাজ করেছি। জোশীমঠ হোক বা সিকিম, তিস্তা হোক বা অলকানন্দা সবার উপরে খবরদারি করেছি।

এবার কি তবে প্রতিশোধের পালা?

বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং পরিবেশ বিজ্ঞানী

দুই বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর জন্মশতবর্ষ

শ্যামল চক্রবর্তী

পাতা ১ এর পর>>

শক্তি কমিশনের সভাপতি হয়েছিলেন।

রাজা রামান্নার সামাজিক ভাবনার একটি মাত্র উদাহরণ দেব আমরা। আমাদের দেশে বিজ্ঞানমনস্কতার স্খলন দেখে বিশিষ্ট বেশ কজন মানুষ একটি স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। সেই বিবৃতির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রামান্না। আজ যখন সত্যিকারের স্খলন চোখে পড়ছে, তখন তাঁর কথা আমরা মনে করব না?

দ্বিতীয় বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন হয়তো তুলনামূলক বেশি পরিচিত। তার একটি সামাজিক কারণ আছে অবশ্যই। তিনি আমাদের দেশে সবুজ বিপ্লবের মুখ্য কারিগর। কোন বিপ্লবই বিতর্কের উর্দ্ধে থাকে না। একে নিয়ে নানা প্রশ্ন অবশ্যই রয়েছে। তবে একটা সময়ে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি। আপ্তবাক্য বিতরণ নয়, মাঠে ঘাটে থেকে কাজ করেছেন।

তাঁর শৈশবের একটি ছোট্ট (সত্যিই ছোট্ট কি?) ঘটনা বলা যাক। কাকার সঙ্গে মাঠে গেছেন। বয়স তাঁর খুবই কম। দেখলেন মেয়েরা সারি বেঁধে মাঠে ধান গাছ রোপণ করছেন। বায়না ধরলেন স্বামীনাথন, তিনিও তাই করবেন। কাকা বললেন, খুবই শক্ত কাজ। এ আর এমন শক্ত কি?

নেমে মাঠে কাজ শুরু করলেন। ক'মিনিট পরেই কোমর ব্যাথা। উঠে এলেন মাঠ থেকে। ভাবতে লাগলেন, কেমন করে মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা নিচু হয়ে ধানের চারা রোপণ করে চলেছে? তাদের প্রতি সহমর্মিতা নয় শুধু, শ্রদ্ধাও বহুগুণ বেড়ে গেল।

এই বোধ আজীবন বহন করেছেন স্বামীনাথন। পরে যখন সাংসদ হয়েছেন, নারীদের শ্রমশক্তির মর্যাদার দাবি করেছেন। এছাড়া স্বামীনাথন কমিশন কৃষকদের জন্যে যে সুপারিশ করেছিল তার জন্যে সারাদেশের কৃষকেরা দীর্ঘকাল লড়াই করেছেন। আত্মাহুতি দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ এই দৃশ্য কখনও দেখেনি।

স্বল্প কথায় রামান্না বা স্বামীনাথন কারও কথাই বলা সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞান প্রচারক বন্ধুরা তাঁদের বিষয়ে আরও জানবেন ও তাঁদের কথা সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন এই প্রত্যাশা রইল।

বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক

বিদ্যাসাগরের পুনর্জন্ম

মানস চক্রবর্তী

শিরোনামটি পড়ে আশ্চর্য হচ্ছেন? ভাবছেন কি ভাবে এক মৃত আত্মার পুনর্জন্ম হতে পারে? আপনার চিন্তাভাবনা একই সাথে ঠিক, এবং ভুল। উভয়ই। এবার আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।

আপনি ঠিকই ভেবেছেন, কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুনর্জন্ম হয়নি। আপনি আবার ভুল, কারণ একটি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির আবিষ্কারের মাধ্যমে তার নাম নতুন করে উঠে এসেছে।

এই নতুন প্রজাতিটি একটি লিভারওয়ার্ট, যা বিদ্যাসাগরের সম্মানে সোলানোস্টোমা বিদ্যাসাগরিয়েনসিস্ (সোলেনোস্টোমাস্টাসি: মার্চ্যান্টিওফাইটা) [Solanostema vidzasagariensis (Solenostomastaceae: Marchantiophyta)] নামে নামকরণ করা হয়েছে।

এই নতুন উদ্ভিদ প্রজাতিটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার জঙ্গলমহল এলাকার বিদ্যাজারা গ্রামে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও বনবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অমল কুমার মণ্ডল এবং গবেষক রশিদুল ইসলাম, কলকাতার বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যুগ্ম পরিচালক দেবেন্দ্র সিংহের সহযোগিতায় আবিষ্কার করেছেন।

সোলানোস্টোমা বিদ্যাসাগরিয়েনসিস্ (লিভারওয়ার্ট)

এই নতুন উদ্ভিদ প্রজাতিটি আসলে একটি লিভারওয়ার্ট। লিভারওয়ার্ট হল ফুল হয় না এমনি এক ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, যা নদীর তীরে, পাথরে এবং এমনকি বড় গাছপালায় আর্দ্র এবং ছায়াময় জায়গায় জন্মায়। সাধারণ উদ্ভিদের বীজ থাকে, কিন্তু লিভারওয়ার্টের বীজ থাকে না। এটি 'স্পোর' বা 'বীজগুটি'র মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে এবং তার নিজের শরীরের মাধ্যমেই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জল এবং খনিজ সংগ্রহ করে।

লিভারওয়ার্ট আকারে এতটাই ছোট যে মানুষ সাধারণত এই উদ্ভিদগুলিকে চিনতে ব্যর্থ হয় এবং পর্যটকরা প্রায়শই অসাবধানতাবশত এগুলিকে পদদলিত করে। গবেষকরা এই উদ্ভিদ প্রজাতিটি ২০১৯ সালে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ সংগ্রহ করা, এবং বিশেষজ্ঞদের এটিকে একটি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করিয়ে রাজি করাতে তাদের প্রায় অর্ধ দশক সময় লেগেছে।

ওঁদের গবেষণার ফলে আরও জানা গিয়েছে যে এই প্রজাতিটি ৩২.৪ কোটি বছর আগের। অযোধ্যা পাহাড় থেকে একটি নতুন লিভারওয়ার্টের আবিষ্কার সে কারণেই বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

এই আবিষ্কারের কাহিনিটি সম্প্রতি ফাইটোট্যাক্সা [৭১৬ (৩): ২১৬২২২ (২০২৫); DOI: ১০.১১৬৪৬/phytotaxa.৭১৬.৩.৫] জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাক্তন এমেরিটাস অধ্যাপক, বোস ইনস্টিটিউট

অণু, পরমাণু এবং....

দেবপ্রসন্ন সিংহ

পারমাণবিক কণার বিস্তার নিয়ে এক চেষ্টা। অণু পরমাণু নিয়ে এক অণু রচনা বা সীমিত শব্দসংখ্যার মধ্যে লেখা। জানি অণু পরমাণুরা জ্ঞানের বিস্তার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলকভাবে এই আঙ্গিনায় এসে ভীড় করছে। আমরা অন্য বিষয়ে থেকেও একটু জেনে যাই বিজ্ঞানের কিছু কথা, হালফিলের কিছু আবিষ্কারের, প্রয়োগের বাণিজ্যে তো বটেই।

পদার্থের অবস্থা কঠিন, তরল, গ্যাস ও plasma এই চার রকম থেকে Bose Einstein Condensate, Fermionic Condensate, Superfluid, Photonic Matter, Droplets ইত্যাদি অবস্থা হয় এবং আরো বেশি হলে বিতর্কে শামিল হয় । পরমাণুতাত্ত্বিক আলোচনায় ইলেকট্রন প্রোটন বা নিউট্রন শব্দগুলি কারো কারো জানা। জানা নিউট্রিনো সম্বন্ধেও। কণার ধর্ম দেখে তাদেরকে বিবিধ গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

লেপটনরা আগেই এসে গেছে। বোসন, ফার্মিয়ন যতটা কণার ভিন্নতায় চিহ্নিত, তার থেকে বেশি প্রচারিত বিজ্ঞানী সত্যেন বোস ও এনরিকো ফার্মির জীবনীতে। আর কণাগুলির সংখ্যাও বাড়ছে।
যেমন একটি হল মিউন , নিজের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী হলেও মিউনের গড় জীবনকাল ২.২ মাইক্রোসেকেন্ড, একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউট্রিনোতে ক্ষয় হওয়ার আগে। মিউওন অনেক প্রকার হয়। ভেঙ্গে ফোটন হয়। প্রোটন ও আরো কণার সংঘর্ষে particle accelerator দিয়ে এটা তৈরী হয়। Particle physics ev high energy physics বলে যে বিষয় ঢুকে পড়েছে, তাতে এসে পড়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল।

এতে কোয়ার্ক এই উপপারমাণবিক রাজত্বকুলে প্রাথমিক ক্ষুদ্র স্থান দখল করে নিয়েছে, একটি অবিভাজ্য হিসেবে। হেডনকে দলের নেতা বানিয়ে হেড্রন-এর দলেই এরা ইলেকট্রনকে নিয়ে ভিড়ে গেল। কোয়ার্ক বুঝতে নিউক্লিয়ার শক্তি চালিত হয়ে বন্ধনকে জোরালো করে।

এরপর এসে গেল tetraquark, যেখানে দুটি কোয়ার্ক আর দুটি এন্টি কোয়ার্কও রয়েছে। আবার Pentaquark এলো, যা তৈরী হল চারটি কোয়ার্ক আর একটি এন্টিকোয়ার্ক নিয়ে।

Gluon, meson, photon Gi baryon এর অবস্থান কোথায় হল? Baryon হল ফার্মিওন-এর দলে, ওই meson এর মত, কোয়ার্ক, এন্টিকোয়ার্ক মিশিয়ে। কোয়ার্ক অনেক রকম মজার নামকরণে রয়েছে, যেমন up বা উপর, down বা নীচু, charm ইত্যাদি। পছন্দ না হলেও কণাদের God, Ghost কণা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী ফাইনম্যানের প্রস্তাবিত Parton মডেলের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

প্রত্যেক পারমাণবিক কণার একটা বিপরীত বা এন্টি-কণা আছে। যেমন এন্টি-নিউট্রিনো, এন্টি-মেসন যেগুলো এদের বিপরীত চার্জ বা আধান। যেমন ইলেকট্রন এন্টির বিশেষ নাম পজিট্রন। চিকিৎসাক্ষেত্রে এদের ব্যবহার হচ্ছে, মেডিকেল ইমেজিং কাজে। PET ev Positron Emission Tomography বিশেষ কাজে লাগে। ভর, চৌম্বক ধর্ম বদলেও এন্টি করার ভীড় বাড়ে।

রসায়নবিজ্ঞানে যেমন element বা মৌলিক পদার্থ চিহ্নিত করে কিছু ধর্ম অনুযায়ী তাদেরকে সাজিয়ে ফেলা হয়, তৈরী হয় Periodic Table বা পর্যায় সারনী, তেমনি Periodic Table of ParticlesI আছে। তারা কেউ কেউ তুলনায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হলেও এই তালিকায় স্থান পায়, যেমন matter বা পদার্থ বা বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জানি, আবার এন্টিম্যাটার বা প্রতিবস্তুর অস্তিত্বেরও পার্থিব প্রকাশ আছে। তার ব্যবহার PET, ক্যান্সার নিরাময়ে রয়েছে । প্রতিবস্তু সৃষ্টি ও তা পাওয়া খুবই শ্রম ও খরচাসাপেক্ষ।

তবে সবই কি স্ট্যান্ডার্ড মডেল ব্যাখ্যায় দেওয়া যায় বা অনুমোদন করে? বহিরাগত কণার সংখ্যাও বেশি করে তাত্ত্বিকভাবে এসে পড়ছে, যাতে সুপারকোয়ার্ক মডেল দাবী করছে কোয়ার্ককেও ভাঙা যায়।

আবার তার থেকেও ছোট কণা আছে। পরীক্ষাগারে অবশ্য তার সন্ধান এখনো মেলেনি। কিন্তু String ev Superstring theory ev Ab¨Î preyon মডেল বলছে এমন কিছুও আছে যা সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাকে একমাত্রিক কম্পনের সাহায্যে object বা বস্তুতে পরিণত করতে পারে। ১৯৭৪ সালে যোগেশ পতি ও আব্দুস সালাম এই ঢ়ৎবুড়হ সড়ফবষ-এর তত্ত্ব পেশ করেন। অনুমানমূলক এই তত্ত্ব এখনও পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপ্রমাণে স্বীকৃতির অপেক্ষায়।

Dark matter, Big Bang, gravitational lens, comic rays, galactic supercluster এইসব হালফিল শব্দ পদার্থের আরও গভীরে গিয়ে নতুন তত্ত্ব আনতে ও জানতে চাইছেন বিজ্ঞানীকুল। প্রতিসাম্য জেনে, প্রয়োজনে thermonuclear bomb তৈরি করে, এবং প্রভূত শক্তি উৎপন্ন করে।

এই সৃষ্টির খেলায় বন্ধন মাপতে ঢাউস যন্ত্র নিয়ে দেশবিদেশে অজস্র অর্থ ব্যয়ে পরীক্ষা, প্রমাণ, বিশ্বাস ও তর্ক নিয়ত চলছে। এ সংখ্যায় তার কণামাত্র নিবেদন করে পাঠককে উসকে দিলাম আরো জানার জন্য বই পত্রিকা ইন্টারনেটে খুঁজতে।

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও কাউন্সিল সদস্য, ইসনা

সবুজ হাইড্রোজেন

দেব প্রসাদ ঘোষদস্তিদার

আমরা প্রায় সবাই জানি যে হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। তবে আবার সবুজ হাইড্রোজেন, ধূসর হাইড্রোজেন, কালো হাইড্রোজেন এসব কেন?
প্রকৃত নিবন্ধে প্রবেশের আগে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার সবুজ ধূসর ও কালো হাইড্রোজেনের মধ্যে পার্থক্য কি?
হাইড্রোজেনের ধরন ও পার্থক্য -
ক) সবুজ হাইড্রোজেন-এর উৎপাদন প্রক্রিয়া - জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি যেখানে বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য (রিনুয়েবল) শক্তি (সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ) থেকে আসে।
জ্বালানি উৎস : নবায়নযোগ্য শক্তি (রিনুয়েবল এনার্জি) দূষণের মাত্রা - শূন্য নির্গমন বৈশিষ্ট্য - পরিষ্কার এবং পরিবেশবান্ধব
খ) ধূসর হাইড্রোজেন
উৎপাদন প্রক্রিয়া - প্রাকৃতিক গ্যাস (ন্যাচারাল গ্যাস, মিথেন) থেকে স্টিম মিথেন রিফাইনিং-এর (ঝগজ) মাধ্যমে প্রস্তুত
জ্বালানি উৎস - প্রাকৃতিক গ্যাস দূষণের মাত্রা - প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) নির্গমন
বৈশিষ্ট্য - বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কিন্তু দূষণকারী
বিশ্বব্যাপী গ্রীন হাইড্রোজেন প্রকল্পসমূহ
=======
বিশ্বের বহু দেশ গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে ও প্রধান প্রকল্প গুলি হল - ইউরোপের জার্মানিতে H2GLOBAL প্রকল্প
আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে গ্রীন হাইড্রোজেন আমদানি করার পরিকল্পনা
ইউরোপের নেদারল্যান্ডসে রটারডাম পোর্টে বিশাল হাইড্রোজেন হাব তৈরি হচ্ছে এবং স্পেনে Hydeal Espana হল ইউরোপের সবচেয়ে বড় গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন চুক্তি
মধ্যপ্রাচ্য - সৌদি আরবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রিন হাইড্রোজেন প্লান্ট, যেখান থেকে বছরে ৬ লক্ষ টন উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করা হয়েছে ও
অস্ট্রেলিয়া: এখানে তৈরি হচ্ছে অঝওঅঘ জবহবধিনষব Hub, সৌর ও বায়ু শক্তি ব্যবহার করে হাইড্রোজেন রপ্তানি প্রকল্প
জাপান ও কোরিয়া - এখানে জ্বালানি কোষ (fuel cell) চালিত গাড়ি ও জাহাজে গ্রীন হাইড্রোজেন ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে ও ভারতবর্ষে গ্রীন হাইড্রোজেন প্রকল্প (বিশদ বিবরণ)
প্রকল্পের নাম -- ন্যাশনাল গ্রীন হাইড্রোজেন মিশন (NGHM)
======
ঘোষণা -- জানুয়ারি ২০২৩
লক্ষ্য মাত্রা -২০৩০ সালের মধ্যে বছরে পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষমতা - প্রায় ১২৫ গিগা ওয়াট (১ গিগাওয়াট = ১০০০ মেগাওয়াট)
বিনিয়োগ - প্রায় ২০, ০০০ কোটি টাকা সরকারি সহায়তা
প্রধান প্রকল্প ও সংস্থা
========
১) রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (RIL) - গুজরাটের জামনগরে গ্রীন হাইড্রোজেন হাব গড়ছে
২) আদানী গ্রুপ : সৌর শক্তির সাহায্যে হাইড্রোজেন উৎপাদনে বড় বিনিয়োগ
৩) ইন্ডিয়ান অয়েল, NTPC, ONGC - এইসব সরকারি কোম্পানিগুলিরও পাইলট প্রকল্প চলছে
৪) গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু : রাজ্য পর্যায়ে হাইড্রোজেন শিল্পের জন্য জমি ও নীতি অনুমোদন
গ্রীন হাইড্রোজেন ব্যবহারের ক্ষেত্র
======
কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রীন হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হবে নিচে তা দেয়া হল:
ক) পরিবহন : হাইড্রোজেন জ্বালানি কোষ (H2 fuel cell) ব্যবহার করে বাস, ট্রাক, ট্রেন, বিমান, ও জাহাজ চালনা
খ) শিল্প : ইস্পাত, সার, সিমেন্ট, উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির (fossil fuel) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার
গ) গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক ব্যবহার : পরিচ্ছন্ন রান্নার গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যতে গ্রীন হাইড্রোজেনের সম্ভাব্য ব্যবহার
গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন পদ্ধতি
======
গ্রীন হাইড্রোজেন তৈরি করা হয় জলের অণু ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা করার মাধ্যমেও যে প্রক্রিয়ায় এটি করা হয় তার নাম ইলেকট্রোলাইসিস (electrolysis). ইলেকট্রোলাইসিস পদ্ধতির মূল ধাপগুলো এরূপ :
ক) জলের বিশুদ্ধিকরণ (ওয়াটার পিউরিফিকেশন):
এই পদ্ধতিতে প্রথমে জলকে ফিল্টার করে বিশুদ্ধ করা হয় যেন এতে কোন খনিজ পদার্থ বা ধূলিকণা না থাকে
খ) ইলেক্ট্রোলাইজার ব্যবহার : এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় দুই ইলেকট্রোডের মাধ্যমে, একটি ধনাত্মক ইলেক্ট্রোড বা অ্যানোড এবং অপরটি ঋণাত্মক ইলেক্ট্রোড বা ক্যাথোড ও জলের মধ্য দিয়ে উপরের উল্লেখিত দুটি ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার ফলে জল এই তড়িৎ বা বিদ্যুতের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় ক্যাথোডে আর অক্সিজেন উৎপন্ন হয় অ্যানোডে
গ) বিদ্যুৎ উৎস :
========
সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ বা অন্য কোন নবায়নযোগ্য উৎস (রিনুয়েবল সোর্স) থেকে এই সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, সেই বিদ্যুতের সাহায্যে জলের বিশ্লেষণ ঘটিয়ে যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করা হয় তাহাকেই বলে গ্রীন হাইড্রোজেন।
সংরক্ষণ পদ্ধতি -
========
হাইড্রোজেনকে উচ্চ চাপে কমপ্রেসড গ্যাস বা তরল আকারে সংরক্ষণ করা হয় ও
৬) বিতরণ ও ব্যবহার
==========
শিল্প যানবাহন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য পাইপ লাইন, ট্যাংক বা সিলিন্ডারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।
সারা দুনিয়াব্যাপী সবুজ হাইড্রোজেন তৈরির যে ধারণা তার মূল উৎস হল :
পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শক্তির সন্ধান যাতে করে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানো। কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে শক্তির উৎপাদনের ফলে পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসের (কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস) গ্যাসের পরিমাণ এতটাই বেড়ে গেছে, যা অচিরেই নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে জীব জগতের বেঁচে থাকা ভয়ানক সংকটের মুখে পড়বে
গ্রীন হাইড্রোজেন তৈরির যে ধারণা তার মূল উৎস ও প্রেরণাগুলো নিচে দেওয়া হল :
১) জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা
২) প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫ সাল) অনুযায়ী সব দেশকে বায়ুতে কার্বনের পরিমাণ কমানোর নির্দেশিকা জারি
৩) নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রদান
৩) শিল্প ও পরিবহন খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি।

প্রবীণ কৃষি বিজ্ঞানী (প্রাক্তন আধিকারিক), পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তি

পাতা ২ এর পর>>

মহুয়া সেনগুপ্ত

Engineering and Regenerative Medicine):
শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনে ন্যানোপ্রযুক্তি দারুণ কার্যকর। ন্যানোস্ট্রাকচারড্ স্কাফোল্ড (nanostructured scaffold) তৈরি করা হয়, যা নতুন কোষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্থান দ্রুত সারিয়ে তোলে। কৃত্রিম হাড়, তরুণাস্থি (cartilage), এবং ত্বকের টিস্যু তৈরিতে ন্যানোমেটেরিয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে।
৪. জিন থেরাপি (Gene Therapy):
জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা বংশগত রোগ নিরাময়ে ন্যানোপ্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ত্রুটিপূর্ণ জিন প্রতিস্থাপনের জন্য ন্যানোভেহিকল (nanovectors) ব্যবহার করে সঠিক জিনকে নির্দিষ্ট কোষে পৌঁছে দেওয়া যায়।
৫. অস্ত্রোপচারে ন্যানো-সরঞ্জাম (Nanotechnology in Surger):
ন্যানোস্কেলে তৈরি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি (surgical instruments) ব্যবহার করে ন্যূনতম অন্তর্ভেদী (minimally invasive) মাইক্রোসার্জারি করা সম্ভব হচ্ছে। এটি অস্ত্রোপচারকে আরও নির্ভুল এবং নিরাপদ করে তুলেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার মানবজাতির জন্য এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। যদিও অনেক প্রয়োগ বা অ্যাপ্লিকেশন এখনও গবেষণাধীন এবং কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান (যেমন, ন্যানোপার্টিকেল ব্যবহারে নিরাপত্তা ও নৈতিকতা), তবুও এটি স্পষ্ট যে ন্যানোমেডিসিন ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাবে। সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং উন্নত নিরাময় পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যানোপ্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং মারণব্যাধি নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম

খড়ের সংকট: গরু খাবে কি?

মহম্মদ আসিফ

বাংলার কৃষকরা এখন আর আগের মতো বিহার ও ঝাড়খণ্ডের শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল নন। স্থানীয় শ্রমিকের অভাব ক্রমশ বাড়তে থাকায়, তারা দিন দিন বেশি করে হারভেস্টার মেশিনের দিকে ঝুঁকছেন। এ বছর বর্ষা ও শরৎ ঋতুর অস্বাভাবিক চলন, এবং আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, কৃষকদের মধ্যে যান্ত্রিক ধান কাটার প্রবণতাকে আরও জোরদার করেছে।

তবে কৃষিক্ষেত্রে হারভেস্টারের এই বাড়তি ব্যবহার নতুন এক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটার ফলে খড়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে রাজ্য জুড়ে খড়ের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে।

খড় শুধুমাত্র গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে নয়; এটি মাশরুম চাষ, ঠাকুর মূর্তি তৈরি, দরিদ্র মানুষের ঘরের ছাউনি, এমনকি খড়-নির্ভর হস্তশিল্পের জন্যও অপরিহার্য উপাদান। খড় গবাদি পশুর হজম প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে, রুমেনের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং সুলভ মূল্যে পুষ্টি সরবরাহ করে। বিশেষ করে শীতকালে বা যখন তাজা ঘাসের অভাব থাকে, তখন খড়ই হয়ে ওঠে প্রধান খাদ্য উৎস। উন্নত মানের খড়

বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং পশুর পরিপাক ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে, যা তাদের খাদ্যগ্রহণের সক্ষমতা বাড়ায়।

কৃষক ও স্থানীয়দের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই অনেক গ্রামে আগের মতো খড়ের মড়াই দেখা যাচ্ছে না। অনেকে আশঙ্কা করছেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে খড়ের ঘাটতি বড় সমস্যার রূপ নিতে পারে।

বেঙ্গল রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মণীশ খান্ডেলওয়াল বলেন, "যান্ত্রিক ফসল কাটায় দক্ষতা যেমন বেড়েছে, তেমনই অতিরিক্ত খড়-খোঁয়াড় মাঠে ফেলে রাখা হচ্ছে, যা আগে প্রথাগত পদ্ধতিতে যত্নসহকারে সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহার করা হতো। সেই খড় - যা একসময় পশুখাদ্য, জ্বালানি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির মূল্যবান উপাদান ছিল - এখন প্রায়ই নষ্ট হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এর ফলে একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষতি, অন্যদিকে পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটছে। গতি অর্জনের নেশায় আমরা হারাচ্ছি টেঁকসই ও নিখুঁত সম্পদ সংরক্ষণের সেই প্রাচীন জ্ঞান।"

মূর্তি শিল্পী পান্ডব পাল বলেন, "যদি মেশিনে ধান কাটার প্রবণতা এভাবেই বাড়তে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বড় সমস্যা দেখা দিতে পারে। আগের বছর এক বোঝা খড়ের দাম ছিল ৪৫ টাকা, এখন তা ১০০ টাকায় পৌঁছেছে।"

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী প্রবীর নাগ

বলেন, "আমি আতপ চালের খড় দিয়ে নানা শিল্পকর্ম ও সজ্জা সামগ্রী তৈরি করি। কিন্তু হারভেস্টার মেশিনে ধান কাটার ফলে খড়ের দাম তিনগুণ বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে খড় পাওয়া সত্যিই কঠিন হয়ে উঠতে পারে।"

অবশ্য, কৃষি বিশেষজ্ঞদের একাংশ এই সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

>>৭

ফুলের মরুভুমি

দেবব্রত সুর

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের গ্রহের উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যার মধ্যে একটি হল খরার বৃদ্ধি। বিশ্বজুড়ে জাতিগুলি বৃষ্টিপাতের কম সময় এবং বাষ্পীভবনের উচ্চ হারের প্রভাব অনুভব করছে, যার ফলে জমি শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ জলের সুবিধা পাচ্ছে না।

এই জল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দেশগুলির মধ্যে রয়েছে চিলি, যাকে ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট বিশ্বের সবচেয়ে জল-সঙ্কটপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে গণ্য করছে। খরা, বিশেষ করে দেশের উর্বর কেন্দ্রীয় উপত্যকাকে প্রভাবিত করেছে, এমন একটি অঞ্চল যা কৃষি রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাহলে জলের অভাবের মুখে স্থানীয় কৃষকরা কীভাবে তাদের ফসল রক্ষা করতে পারে? বিজ্ঞানীরা এটি জানতে মরুভূমির দিকে ঝুঁকছেন।

চিলির আতাকামা মরুভূমি বিশ্বের সবচেয়ে শুষ্ক মরুভূমি, যেখানে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এটি কেবলই শুষ্ক হয়ে উঠছে। তার উপরে, এই মরুভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সৌর বিকিরণ এবং অতিবেগুনী বিকিরণযুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি, যা জীবনের বিকাশকে কঠিন করে তোলে।

তবে, অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। মরুভূমিতে বিরল বৃষ্টিপাতের সময়, বছরের বেশিরভাগ সময় সুপ্ত থাকা বীজ থেকে ফুল ফোটে। এই ফুল, যাকে "ফুলের মরুভূমি" বলা হয়, একটি অসাধারণ দৃশ্য যা গড়ে প্রতি পাঁচ থেকে ছয় বছর অন্তর ঘটে, মানুষ এই বিরল প্রদর্শন দেখতে মরুভূমিতে ভিড় করে। এই বছরটি ছিল সেই সৌভাগ্যবান বছরগুলির মধ্যে একটি, যেখানে চিলির শীত কাল জুড়ে ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা জেনেটিক সিকোয়েন্সিং পরীক্ষার মাধ্যমে এই ফুলগুলি নিয়ে গবেষণা করছেন এমন সূত্র খুঁজে বের করার জন্য যা ফসলকে খরা এবং চরম তাপমাত্রার পরিবর্তন থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে।

এই ফুল দুটি ধরণের সালোকসংশ্লেষণের মধ্যে পরিবর্তন করে। খরা, লবণাক্ততা বা তীব্র সূর্যালোকের মতো চাপের মধ্যে, উদ্ভিদটি ঈঅগ সালোকসংশ্লেষণে স্যুইচ করে, যা আরও জল-সাশ্রয়ী পদ্ধতি। যখন পরিস্থিতি কম চাপযুক্ত হয়ে ওঠে, তখন এটি আরও সাধারণ C3 সালোকসংশ্লেষণে ফিরে যায়।

বিজ্ঞানীরা খরার পরিস্থিতিতে উদ্ভিদের কোন জিনগুলি প্রধান ভূমিকা পালন করে তা সনাক্ত করার চেষ্টা করছেন। আশা করা যাচ্ছে যে অবশেষে সেই জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলি ফসলে স্থানান্তরিত হবে যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুত গতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

সদস্য, অরগ্যানাইজিং কমিটি, ইসনা

দক্ষিণ বঙ্গের মাদুর কাঠি চাষ: পরিবেশগত প্রভাব

বিনয় কৃষ্ণ মাইতি

মাদুর শিল্প হচ্ছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লক ও তার আশপাশের এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প। এই এলাকায় সাধারণ মানুষ দের জীবন যাপন এই শিল্পের উপর নির্ভর শীল। তারা বাড়ীতে সারা সপ্তাহ ধরে মাদুর বনন করে এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে বাজারে গিয়ে ওই মাদুর বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে তাদের সংসারের জন্য ওই সপ্তাহের বাজার করে। এটি সম্প্রতি জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত শিল্প।

এমনকি এই শিল্পের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহু পুরনো- সেই মহাভারত থেকে। মোঘল সম্রাট ও এই শিল্পের কদর করতেন। আসলে মাদুর হচ্ছে একধরনের কার্পেট যা মাদুর কাঠি নামে এক ধরনের ঘাস দিয়ে তৈরি। প্রত্যেক মাদুর শিল্পীর বাড়িতে একটি ফ্রেম আছে যাকে বলা হয় মাদুর আড়া। একটি নির্দিষ্ট ধরনের যাঁতা ব্যবহার করে শুকনো মাদুর কাঠিকে হাতে বুনে মাদুর তৈরি করা হয়।

এছাড়াও এখন এই কাঠি দিয়ে বিভিন্ন হ্যান্ডি ক্র্যাফট জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। যেমন ব্যাগ, টুপি, আসন ইত্যাদি। এই কাঠিগুলো এক ধরনের ঘাস থেকে তৈরি হয় যা ঈঢ়বৎধপবধব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই এই মাদুর কাঠি পেতে এই জাতীয় ঘাসের চাষ করতে হয়।

বছরে তিন বার মাঠ থেকে এই ঘাস কাটা হয় এবং একে সরু করে চেরাই করে রোদে শুকিয়ে এই কাঠি পাওয়া যায়। এই সবং এবং এর আশপাশে মাদুর কাঠির চাষ হয়। এখন আবার এই মাদুর কাঠি ঘাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাচ্ছে। অনেক এলাকায় পুরো ধান চাষের জমির চরিত্রের বদল হয়ে মাদুর কাঠি চাষ জমিতে পরিনত হয়েছে। তবে ভেবে নেবেন না যে এই বৃদ্ধির কারণ মাদুর শিল্পের ব্যাপক প্রসার এবং অর্থনৈতিক লাভজনক। বরং উল্টো। এই মাদুর শিল্প পরিবারের নির্দিষ্ট বয়সের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জেন জেড রা তো ছাড়ুন, জেন ওয়াই রা ও এই শিল্পের বিমুখ।

মাদুরের দাম তুলনামূলক বৃদ্ধি না পাওয়া এই বর্তমান প্রজন্মের বিমুখতার কারণ। তাহলে এই মাদুর কাঠি চাষের কারণ কী? কারণ হল এই ঘাসের গোড়া, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে কাঠি মুড়া যা মাটির নিচে থাকে। এই কাঠিমুড়ার জন্য কৃষক একর প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা পেয়ে যাচ্ছে যা ধান চাষে কখনোই সম্ভব নয়। এই কাঠিমুড়া থেকে একপ্রকার তেল পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য অনেক। জমি শুকনো থাকলে এবং কাঠি কাটা হয়ে গেলে এক একজন ব্যবসায়ী বেশ কিছু লেবার নিয়ে গিয়ে পাওয়ার টিলার দিয়ে মাটি থেকে মুড়া তুলে তার থেকে মাটি ঝাড়িয়ে বস্তায় ভরে বড় সড়কের পাশে থাকা বিভিন্ন গোডাউনে বিক্রি করে এবং ওই আড়ৎদার বড় বড় কন্টেনার এ ভর্তি করে বাইরের রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে এখানে ও ছোটো খাটো এই কাঠিমুড়া থেকে তেল মাড়াই মেশিন বসেছে। ফলে কৃষকরা লাভবান হচ্ছে। ফলে এলাকার জমির চরিত্র ও বদলাচ্ছে একেবারে জ্যামিতিক হারে।

এরফলে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে মানে প্রচুর পরিমাণে মাদুর কাঠি জন্মাচ্ছে। এই প্রচুর পরিমাণে মাদুর কাঠি নিয়ে কৃষক রা কী করবেন? একেতো বর্তমান প্রজন্ম মাদুর শিল্প থেকে সরে যাচ্ছে। আর অন্য দিকে ওই কাঠি গুলোকে প্রসেস করতে অনেক সময় ও লেবার প্রয়োজন। ফলে কৃষকরা একটি উপায় বের করছেন তাহল এই কাঠি গুলোকে মাঠের মধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া। এতে আরও একটি বাহ্যিক উপকার হয় তা হল ওই জমির আগাছা নষ্ট হওয়া এবং ছাই এর ব্যবহার করা। অর্থাৎ কৃষক রা মাঠের এই কাঠিকে বর্জ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন। মাঠে এই কাঠি পোড়াতে সমাজের পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ঘাস কাটা মেশিন দিয়ে মাঠের পর মাঠ এই কাঠি কেটে কিছু দিন ওই মাঠে শুকিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে তেল মাড়াই মেশিন থেকে তেল মাড়াই এর পর যে কাঠি-মুড়ার বর্জ্য পড়ে থাকে সেগুলো ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে এদিক থেকে ও পরিবেশ দূষণ হয়ে চলেছে।

এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমাদের কে এইসব মাদুর কাঠি এবং কাঠিমুড়া ছিবড়ের ব্যপক ব্যবহার এর উপর জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বায়োডিগ্রেডেবল প্লেট ইত্যাদি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা তার দেখতে হবে। তবে এই মাদুর কাঠি চাষের ব্যাপকতা পরিবেশ গত ভাবে গ্রহন যোগ্য হবে।

স্বচ্ছতা সারথি ফেলো ২০২১, উচিতপুর, কেরুর, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বঙ্গ

কিশলয়ের আঙিনায়

বাজি নয়,আলোতেই হোক আনন্দ

নবীনা রায় মজুমদার

বাংলার উৎসব মানেই আলো, গান, নাচ, আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর একটি পরিবেশ। পুজো, দীপাবলি কিংবা অন্য যেকোনো আনন্দঘন মুহূর্তে বাজির ঝলকানি ও শব্দ যেন উৎসবের আবহকে দ্বিগুণ করে তোলে। কিন্তু এই ঝলমলে আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক ভয়ংকর বাস্তব দূষণ, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি। আজ তাই সময় এসেছে সচেতন হওয়ার, আনন্দের সঙ্গেই নিরাপত্তাকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার। বাজির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কু-প্রভাবের কিছু দিকই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পরিবেশের ওপর বাজির প্রভাব- বাজির প্রধান উপাদান হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার ও অ্যালুমিনিয়াম পাউডার। এগুলো জ্বললে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। এই গ্যাসগুলো শুধু মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, পরিবেশকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

বায়ুদূষণ: বাজি ফাটানোর পর বাতাসে ধোঁয়া ও বিষাক্ত কণা জমে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি বা হার্টের রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শব্দদূষণ: ডেসিবেল সীমা অতিক্রম করা বাজির শব্দ বয়স্ক মানুষ, শিশু এবং পশুপাখির জন্য ভয়ানক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রাণীকুলের ক্ষতি: হঠাৎ বাজির বিস্ফোরণে পোষা প্রাণী ভয় পায়, রাস্তার কুকুর-বিড়াল আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি করে দুর্ঘটনার শিকার হয়। পাখিরা দিকভ্রান্ত হয়ে মারা যায়।

মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি-বাজির প্রভাব সরাসরি পড়ে মানুষের শরীরে। চোখ জ্বালা, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, এমনকি ত্বকের সমস্যা বাড়তে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাজি থেকে নির্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা (চগ২.৫ ও চগ১০) ফুসফুসে জমে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদে ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর এর প্রভাব পড়ে সবথেকে বেশি।

দুর্ঘটনা ও আগুন লাগার আশঙ্কা-

প্রতি বছর দীপাবলি কিংবা বর্ষবরণের রাতে বহু মানুষ বাজি বিস্ফোরণে আহত হন। কারো হাতের আঙুল উড়ে যায়, কারো বা চোখ চিরতরে নষ্ট হয়। হাসপাতালের বার্ন ইউনিটগুলো ভরে ওঠে এ ধরনের দুর্ঘটনায়। বাজির আগুন থেকে ঘরবাড়ি, দোকানপাট, এমনকি গোটা এলাকায় অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। এক মুহূর্তের অসতর্কতায় যে আনন্দ, সেটাই ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হতে পারে।

আইনি দিক- সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম চালু করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে বাজি ফাটানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পাশাপাশি উচ্চ শব্দের বাজি ও পরিবেশবিধি ভঙ্গকারী আতসবাজি বাজারে নিষিদ্ধ। তবুও নিয়ম ভেঙে অবাধে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, যা আমাদের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার প্রমাণ।

সামাজিক প্রভাব- উৎসবের সময় আনন্দ ভাগাভাগি করার কথা। কিন্তু বাজির কারণে অনেকেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। অসুস্থ মানুষরা ভোগেন শারীরিক যন্ত্রণায়। পরীক্ষার সময় হলে পড়াশোনার ক্ষতি হয়।

প্রবীণরা মানসিক অশান্তিতে থাকেন। রোগী ভর্তি হাস-পাতালগুলোর আশেপাশে বাজির শব্দ নিদারুণ কষ্ট দেয়।

অর্থাৎ কয়েক মুহূর্তের আনন্দ অসংখ্য মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

বিকল্প আনন্দের পথ- প্রযুক্তি আর সৃজনশীলতার যুগে আনন্দ প্রকাশের হাজারও উপায় আছে। পরিবেশবান্ধব যে বাজি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলোতে বিষাক্ত উপাদান নেই এবং শব্দও সীমিত। পাশাপাশি প্রদীপ, আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আকাশে ফানুস ওড়ানো উৎসবের আমেজ বাড়াতে পারে।

সচেতনতার প্রয়োজন- সমাজে সচেতনতা তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। স্কুল, কলেজ, ক্লাব বা পাড়ার সংগঠনগুলো যদি মানুষকে বোঝাতে এগিয়ে আসে তবে পরিবর্তন সম্ভব। মিডিয়া ও সংবাদপত্রের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ বাঁচাতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ পৃথিবী দিতে হলে বাজি থেকে সাবধান হওয়া অপরিহার্য।

উৎসব আনন্দের প্রতীক, জীবনের রঙ। কিন্তু আনন্দ যদি অন্যের কষ্টের কারণ হয় তবে সেই আনন্দের কোনো মূল্য নেই। বাজির ঝলকানি ক্ষণস্থায়ী, অথচ তার ক্ষতি দীর্ঘস্থায়ী। তাই আমাদের সকলের দায়িত্ব৩নিজে সাবধান হওয়া, অন্যকে সাবধান করা এবং নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উৎসবের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আনন্দ হোক আলোয়, শব্দে নয়। সুখ ছড়াক ভালোবাসায়, ধোঁয়ায় নয়।

বিজ্ঞান লেখিকা

রেডিও কলকাতায় ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান: প্রকৃতির পাঠশালা

সীমা মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো অনেকেই রেডিও বা টিভিতে ছোটদের জন্য যেসব অনুষ্ঠান হয় শুনতে বা দেখতে ভালোবাস। আজ তোমাদের একটা অন্য ধরনের অনুষ্ঠানের কথা জানাব। এই অনুষ্ঠানের নাম "প্রকৃতির পাঠশালা।" এই অনুষ্ঠানটি শুনতে হয় ইন্টারনেট রেডিওর মাধ্যমে। এখানে গাছপালা, পশুপাখি, কীট পতঙ্গ, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, জলা ভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সেই বিষয়টি নিয়ে সহজ সরল ভাবে আলোচনা করা হয় নানাভাবে। তার সঙ্গে থাকে মান-ানসই ছড়া, গান, কবিতা, গল্প বা মজার নকশা। আর থাকে পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিচিত্র সংবাদ। তোমাদের মত ছোট্ট বন্ধুরাই গান, ছড়ার গান, কৌতুক নাটিকা বা আবৃত্তি করে থাকে। যেমন ধর, পুজোর সময় দুর্গাপুজোর বাহনদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। সেখানে তোমাদের মত ছোট্ট দুই খুদে বন্ধু মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে দেখতে কি কথা বলেছিল তা জেনে নেওয়া যাক :

বাহনদের মনের কথা

টুনি --- দেখ বুলি, গণেশ ঠাকুরের পায়ের তলায় ইঁদুরটা কেমন করে তাকিয়ে আছে সন্দেশের দিকে।

বুলি --- আরে তাকিয়ে থাকবে না কেন? ও তো এখন বাহন হয়ে গেছে, গণেশ ঠাকুরের বাহন। ও এখন ইচ্ছে করলেও ওখান থেকে লাফিয়ে নেমে সন্দেশ খেতে পারবে না।

টুনি --- ঠিক বলেছিস রে বুলি। মা দুগ্‌গার পুজোয় বাহনদের বড্ড কষ্ট কি না বল? ওদের এই অল্প জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে চারটে দিন আটকে থাকতে হয় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে।

বুলি --- তাইতো! দেখ না, ময়ূর ভায়া কির'ম মুখ গোমড়া করে কার্তিককে পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।ওর কি কার্তিককে পিঠে নিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে? ওরও তো ইচ্ছে করে পুজোর ক'টা দিন পাখনা মেলে নেচে বেড়াতে। সবাই কেমন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আনন্দ করছে। আর ওরা বাহন হওয়ার জন্য প্যান্ডেলে আটকে রয়েছে।

টুনি--- ঠিকই বলেছিস। ওদের বড় কষ্ট। এইতো রাজহাঁস বেচারি কি সুন্দর জলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পুজোর দিনগুলো ওদের জলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ। আর জল পাবেই বা কোথায় এখানে? চারিদিকে পুকুর, ডোবা, নদী সবই তো শুকিয়ে যাচ্ছে।

বুলি---তুই ঠিক কথাই বলেছিস। তবে প্যাঁচার তো কোন কষ্ট নেই। ও তো দিনের বেলায় ঘুমোয়। রাতে যখন জেগে উঠবে তখন প্যান্ডেলে লোকজন থাকবে না। আর, ওর অত কষ্টও হবে না।

টুনি--- তোমায় কে বলেছে, রাতে লোকে ঠাকুর দেখে না? আজকাল তো ভিড় হয় বলে লোকে রাত্রেই বেশি ঠাকুর দেখে।

বুলি--- সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। অনেকেই রাত্রে ঠাকুর দেখতে বেরোয় ভীড় এড়াতে আর লাইটিং দেখতে।

টুনি--- আরে দেখ দেখ বুলি, সি-ংহটা যেন মনে হয় আমাদের কথা সব শুনতে পাচ্ছে। দেখ কেমন আমাদের দিকে রেগে তাকিয়ে আছে। চল পালাই বাবা, যদি জেগে ওঠে।

বুলি--- চল বাবা, পালাই এখান থেকে। আর ঠাকুর দেখে কাজ নেই।

প্রতিটি অনুষ্ঠানেরই একটা করে নাম থাকে। যেমন ধর, গাছপালা চিনতে হলে, মৌমাছি পালন, মাটির কাছাকাছি, দুর্গাপুজোর বাহন, চাঁদের দেশে, প্রকৃতিবিদ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, আমটি আমি খাব পেড়ে, হাতি মেরে সাথী, গন্ডার, জল সংকট, বসুন্ধরা দিবস, সাগর সন্ধানে, জলা ভূমির আঙ্গিনায়, পর্বতের কথা, বাদাবন ইত্যাদি।

কি, নামগুলো থেকে কেমন ধরনের অনুষ্ঠান হয় শুনতে ইচ্ছা করছে বুঝি? তাহলে জেনে নাও কিভাবে এই অনুষ্ঠান শুনতে হবে। প্রথমেই মোবাইল বা কম্পিউটারে গুগল-য়ে গিয়ে টাইপ করতে হবে ৎধফরড়শড়ষশধঃধ.ড়ৎম এবং ষরাব হড়বাটন ক্লিক করতে হবে ঠিক রাত ন'টায় প্রতি মাসের শেষ শনিবারে। তাহলেই শুনতে পাওয়া

যাবে "প্রকৃতির পাঠশালা"র এই অনুষ্ঠান।

তোমরাও কিন্তু যোগদান করতে পার এই অনুষ্ঠানে। কী ভাবে? প্রকৃতির পাঠশালায় একটা নতুন বিষয় শুরু করা হবে খুব শীঘ্রই। সেখানে প্রকৃতি সম্পর্কিত কোন লেখা, গান, কবিতা, ছড়া আবৃত্তি করে, সেটা তোমরা রেকর্ড করে আমাদের দপ্তরে পাঠাতে পার। নিচে হোয়াটস'অ্যাপ নম্বর দিয়ে দেয়া হল।) তবে চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেকর্ডিং রাখতে হবে। তার সাথে নাম, ঠিকানা, কোন শ্রেণীতে পড় এবং হোয়াটস'অ্যাপ নাম্বার লিখতে হবে।

যদি মনোনীত হয় আমরা প্রকৃতির পাঠশালার অনুষ্ঠানে বাজাব এবং অবশ্যই আগে থেকে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও তোমরা এই অনুষ্ঠান কেমন লাগছে বা আর কি হলে ভালো হয় ইত্যাদি আমাদের দপ্তরে জানাতে পারো। আজ এখানেই শেষ করছি। সবাই ভাল থেক।

বিশ্ব বাঘ দিবস

সৈকত কুমার বসু

বিশ্ব বাঘ দিবস - বাঘ সংরক্ষণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর এই দিনটি ২৯শে জুলাই পালিত হয়। এটি ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন কর্তৃক শুরু হয়েছিল, যিনি আমুর বাঘকে বাঁচানোর লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। তিনি রাশিয়ায় বাঘ শিকার, অবৈধ বাণিজ্য, পরিবহন বা সংরক্ষণের জন্য কঠোর শাস্তি এবং দীর্ঘ কারাদণ্ডের বিধানকারী আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন।

আমুর টাইগার সেন্টার হল রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্যোগে রাশিয়ান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এই দিবসের লক্ষ্য বাঘের প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা প্রচার করা এবং বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা এবং সমর্থন বৃদ্ধি করা।

বিশ্বজুড়ে বাঘ দিবস পালিত হওয়ার পর প্রায় দেড় দশক হয়ে গেছে, এশিয়ার অনেক দেশে বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিও পেয়েছে। কিছু দেশে, যেখানে বাঘ একসময় রাজত্ব করত, সেখানে কিছু পুনরুদ্ধার প্রকল্প শুরু করাও হয়েছে।

তবুও এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠছে। বিপুল সংখ্যক বন্য বাঘের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভারত কি প্রজেক্ট টাইগারের স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করেছে? দেশজুড়ে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের কি বাঘের প্রয়োজনীয়, নিরাপদ সংরক্ষিত আবাসস্থল এবং বাঘের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য কি বনে আছে? আমরা কি সত্যিই বাঘের বিস্তৃত বিস্তার আন্ত রিকভাবে গ্রহণ করছি?

রাশিয়ার মতো তুলনামূলকভাবে কম জনসংখ্যার দেশগুলি বাঘের বিকাশের জন্য বিশাল সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করার বিলাসিতা বহন করতে পারে। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালের মতো অত্যন্ত জনবহুল দেশগুলি দীর্ঘমেয়াদে বাঘের জন্য এই ধরনের বন্য আবাসস্থল ছেড়ে দিতে অবশ্যই দ্বিধা করবে।

মানব জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং তাদের চাহিদা মেটাতে - উন্নয়ন, কৃষিকাজ এবং খনির জন্য অরণ্য হারিয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের মূল্যবান বন সম্পদ হারাবো । পর্যটনের কারণে ভারতে বাঘ এখনও টিকে আছে এবং অন্যান্য কিছু দেশও এটিকে বিশাল অর্থ প্রবাহের উৎস হিসেবে দেখছে। ক্রমবর্ধমান বাঘের জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ভারতের অনেক অংশে বাঘ-মানব সংঘাত সৃষ্টি করছে।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল - আমরা কি সত্যিই আমাদের দেশের (এবং বিশ্বের) জীববৈচিত্র্যকে প্রাকৃতিক আবাসস্থল হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাই, নাকি ভবিষ্যতে কিছু বন্য বাঘকে ঘেরা জায়গার ভিতরে ঘুরে বেড়াতে দেখলেই খুশি হব?

বন্যপ্রাণী এবং তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস করা অদূর ভবিষ্যতে সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ হবে। বাঘের ভবিষ্যৎ কতটা কার্যকর এবং নিরাপদ হবে তা আসন্ন সময়ের উপর নির্ভর করবে।

সদস্য, অরগানাইজিং কমিটি, ইসনা

বাঁচতে হলে

অর্পিতা চক্রবর্তী

গলছে দেখো হিমবাহ
বাড়ছে জল তল
সতর্ক হও বাঁচতে হলে
লোভী মানুষের দল
ডুবছে জমি ফ্ল্যাট ও বাড়ি
ডুবছে সমতল
বাঁচাও নদী গাছ ও পাহাড়
নয়তো সব যাবে রসাতল

সদস্য, অর্গানাইজিং কমিটি, ইসনা

রঞ্জন রশ্মি কথা

মালবিকা সেনগুপ্ত

প্রতি বছর ৮ ই নভেম্বর দিনটি সারা বিশ্বে "ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ রেডিয়োলজি" হিসেবে পালিত হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের এই দিনেই উইলহেল্ম কনরাড রন্টজেন সর্বপ্রথম এক্স -রে আবিষ্কার করেন, বাংলায় যা আমাদের কাছে রঞ্জন রশ্মি হিসাবেই পরিচিত।

জার্মানীর উজবের্গ বিশ্ববিদ্যালযের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক উইলহেলম কনরাড রন্টজেন গবেষণা করতে করতে আকস্মিক ভাবে রন্টজেন রশ্মি বা এক্স-রে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন ও

তার এই হঠাৎ আবিষ্কারের কাহিনী সত্যিই রোমাঞ্চকর ও বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস বায়ুশূন্য টিউবের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে টিউবের নেগেটিভ বা ক্যাথোড প্রান্ত থেকে পজিটিভ বা এনোড প্রান্তের দিকে সরলরেখায় একটি রশ্মি ছুটে চলেছে। পথে বাধা পেলে সেটা কিন্তু ভেদ করে এগোতে পারছে না ও সেখানেই একটি আলোর সৃষ্টি করছে। এই রশ্মিই ক্যাথোড রশ্মি নামে পরিচিত ও চুম্বক ক্ষেত্রে এই রশ্মিই কাজ করে ও

একদিন বিজ্ঞানী রন্টজেন এই ক্ৰুকস টিউবের মধ্যে ক্যাথোড রশ্মি চালনা করে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি টিউবটিকে একটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন ও যে টেবিলে পরীক্ষা করছিলেন সেখানে তখন বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড মাখানো একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট রাখা ছিল। তিনি হঠাৎ দেখেন যে ওই প্লেটটি সবুজ রঙের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সবিস্ময়ে তিনি তাঁর হাতটি প্লেটের সামনে তুলে ধরলেনও তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে হাতের কোনো ছায়া সেখানে পড়লো তো নাই, বরং সেখানে হাতের হাড়গুলিরই ছায়া ফুটে উঠল ও একটি বিরল মুহূর্তে এক যুগান্তকারী রশ্মি আবিষ্কৃত হল, যা পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ও

তিনি বিশ্ববাসীকে জানালেন যে সাধারণ রশ্মিকে যে সকল জিনিস বাধা দেয়, তা কিন্তু এই রশ্মিকে বাধা দিতে পারে না। যে বস্তুর ঘনত্ব বেশি সেখান দিয়ে এই রশ্মি যেতে পারে না। সে কারণেই টিউবের কাঁচ, কালো কাপড় ও হাতের মাংস ভেদ করে এই রশ্মি প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু হাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারেনি, তাই তার ছায়া ফুটে উঠেছে ও

তিনি নিজে এই রশ্মির নাম দিয়েছিলেন এক্স-রে বা অজানা রশ্মি! তাঁর নামানুসারে এই রশ্মির নাম হয় রন্টজেন রশ্মি ও ১৯০১ সালে তাঁর এই অসামান্য আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ও

ভারতবর্ষে কলকাতা শহরবাসী সর্বপ্রথম এক্স- রে সংক্রান্ত এক্সপেরিমেন্ট প্রত্যক্ষ করেন সেই যুগের এক প্রখ্যাত ডাক্তার বাবুর কাছে। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার। এক্স-রে আবিষ্কারের খবর কলকাতায় এসে পৌঁছানোর সাথে সাথেই তিনি ইউরোপের ডুক্রেটেট কোম্পানিকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার করেন।

১১ ই জুন, ১৮৯৬ সালে রন্টজেন ক্যাথোড রে টিউব কলকাতায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্যা কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে এসে পৌঁছয়। কিন্তু কোম্পানি থেকে ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন পাঠাতে ভুল হয়ে যায়। ২০শে জুন, ১৮৯৬ সালে বহু প্রতীক্ষিত সেই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখানো হয়।

প্রথম প্রচেষ্টাতে তিনি কিন্তু সফল হলেন না। আবার ২৩শে জুন একটি হাতের ছবি নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এবারে ডাক্তার সরকার সফল হলেন। কলকাতার নাম একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেল। এটি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক্স-রের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।

এবারে কলকাতার অপর এক বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ইউরোপ ভ্রমণের পরে কলকাতায় ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে >>৭

শুভাংশু শুক্লা ইতিহাস গড়লেন

রাজদীপ দে

২৯ মে, ২০২৫ এই দিনটি ভারতের মহাকাশ ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হল। এই দিনই ভারতীয় মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা; যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইভেট মহাকাশ সংস্থা অীরড়স ঝঢ়ধপব গরং-ংরড়হ-এর অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) রওনা দিয়েছিলেন। এটি শুধু একটি মহাকাশযাত্রা ছিল না, বরং বেসরকারি মহাকাশ গবেষণার যুগে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

Axiom Space হল একটি মার্কিন বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা ভবিষ্যতে পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশন গড়ে তুলতে চায়। NASA-র সহযোগিতায় এই মিশনটি পরিচালনা হয়েছিল। এই মিশনে বিভিন্ন দেশের (ইতালি, তুরস্ক ও সুইডেন) চারজন মহাকাশচারী অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে শুভাংশু শুক্লা ছিলেন একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি। তিনি একজন প্রাক্তন বিমানবাহিনীর পাইলট এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁকে এই মিশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল দীর্ঘ প্রস্তুতি ও দক্ষতার ভিত্তিতে।

>>৭

আমি পড়ব, লিখব এবং....

শান্তনু সোম

এক সময় ভাবা হত, যে পড়াশুনো জানে না, মানে যে লিখতে পারে না, সে নিরক্ষর।

লিখতে পারা কমিউনিকেশনের একটি অন্যতম মাত্রা। কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু লেখা রয়ে যায়। লেখক যখন সেখানে নেই তখনও তার লেখা রয়ে যায়। তাই মা সরস্বতীর পূজায় খাগের কলম ও দোয়াত দিয়ে আমরা পূজা করি। লেখা না থাকলে থমকে যাবে সাহিত্য চর্চা, বন্ধ হবে রাজকার্য। এতদিন এরকমটাই ভাবা হত।

কিন্তু যদি আমি বলি যে এই ডিজিটাল যুগে যে ঠিক করে কথা বলতে পারে সেই সাক্ষর? কেমন লাগবে এই কথা শুনতে?অনেকেই অবশ্য বলবেন, এ আবার কেমন কথা?

ভারত ভাষার দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এক দেশ। দেখা যাক আমি ওপরে যে কথাটি বললাম তাকে ভারতের আঙ্গিকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কবি বলে গেছেন - নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।

এখানে ভাষা, বিবিধ আর মিলন শব্দ তিনটিকে আলাদা করে নেওয়া যাক। ভারতের আঞ্চলিক ভাষা ২৪টি। এই আঞ্চলিক ভাষার উপভাষা বা ডায়ালেক্ট ধরলে প্রায় ৬০০র কাছাকাছি হবে। এটা হল বিবিধ।

আর এর মিলন করতে হলে প্রযুক্তির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ভাষা বিস্তারে প্রযুক্তি চিরকালই ব্যবহার হয়েছে, সেই তামার স্টেনসিল থেকে ছাপাখানার মেশিন যা দিয়ে নানা হরফে বই বা ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে থাকে।

ভাষা দিয়ে কনটেন্টও তৈরি হয়। এতদিন এই কনটেন্ট ছিল ফিজিক্যাল। কমপিউটার আর সফটওয়্যারের বিকাশের সাথে সাথে কনটেন্ট ফিজিক্যাল থেকে ডিজিট্যাল হয়ে গেল।

কনটেন্ট ডিজিটাল হবার সাথে সাথে একটা নতুন সুবিধে হল। সেটা হল এই ডিজিটাল কনটেন্ট, যেটা বই, ম্যাগাজিন, গান, ছবি বা ভিডিও যাই কিছু হতে পারে। সেটা আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান প্রদান করতে সক্ষম হলাম। এরপর এল সোশ্যাল মিডিয়া।

ভাষার ডিজিটালাইজেশনের আর তার প্রসার হওয়া খুবই জরুরি। ভারতের জনসাধারণের যদি একটা ভাষা সক্ষমতার বা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাপাবিলিটি গ্রুপিং করা হয় তাহলে আমরা তিন রকমের মানুষ পাব।

এক: ইংরেজি বলতে পারে, লিখতে পারে। মাতৃভাষা বলতে ও লিখতে পারে।

দুই: ইংরেজি বলতে লিখতে পারে না, কিন্তু নিজের মাতৃভাষা বলতে ও লিখতে স্বচ্ছন্দ।

তিন: শুধু মাতৃভাষা বলতে বলতে পারে, লিখতে পারে না।

প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ এই দুই আর তিন কে নিয়ে।

আমি নিজে অনেক দিন আগে থাকতেই ভাষার ডিজিটাইজেশন নিয়ে সামান্য কিছুটা কাজ করেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সাথে ভারতীয় ভাষার এনএলপি না ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোসেসিং নিয়ে কাজ করেছি কিছু সময়। রচেস্টারে কাজ করেছি, ফন্ট এর ভেক্টরাইজেশন নিয়ে। বলার মতন আহামরি কিছু নয়, তবু বলছি এই কারণে, আমি সাবজেক্টটা হয়তো কিছুটা জানি, বুঝি।

ভারতীয় ভাষার ডিজিটাইজেশনের চ্যালেঞ্জ বহুমুখী। এক প্রত্যেকটি ভাষার ক্যারেকটার স্ক্রীপ্ট আলাদা। বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি সব আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, কদাচিৎ হয়তো, অহমীয়া ও বাংলার মধ্যে এরকম মিল থাকে।

এতগুলো স্ক্রিপ্টের ভেক্টরাইজেশন, ওসিআর ও স্পিচ টু টেক্স আর টেক্সট টু স্পিচ করা খুব সহজ কাজ নয়। এর ওপর আবার রয়েছে ট্রান্সলেশন ও ট্রান্সলিটারেশনের সমুদ্র প্রমাণ কাজ।

এই সবগুলো কাজ করতে পারলেই একটা এমন ইকোসিস্টেম তৈরি হবে যেখানে একজন মানুষ তাঁর মাতৃভাষায় কথা বললে সেই কথা স্পিচ টু টেক্সট হয়ে কোন এক সিস্টেমে টেক্সট হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

সেই টেক্সট প্রয়োজন মত সংরক্ষিত হতে পারে। আবার, সেই টেক্সট থেকে অনুবাদ হয়ে তা অন্য ভারতীয় ভাষা বা ইংরাজিতে অনূদিত হতে পারে বা টেক্সট টু স্পিচ হয়ে তা ভিন্ন ভাষার আরেকটি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে।

ভেবে দেখলে এর প্রয়োগ সীমাহীন। আর যেটা বলছিলাম - শুধু কথা ঠিক মত বলতে পারলেই আপনি কিন্তু আর নিরক্ষর নন। একটি ডিজিটাল ল্যাঙ্গোয়েজ ইকোসিস্টেম আপনাকে সেই সক্ষমতা দেবে যেখানে আপনি একজন লিখতে পারা মানুষের সমকক্ষ।

এর ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী। ভারতের প্রত্যিকটি মানুষকে এই ভার্বাল - রিটন ব্যারিয়ারের বাইরে বের করে আনতে সক্ষম হলে সেটা হবে এক বিপ্লব। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন আর কোন কারনেই আটকে থাকবে না।

এবার আসি কাজের কথায়। তাহলে ভারতবর্ষ এখন কি করছে? সরকারই বা কি করছে? তাহলে আসতে হয় AI4bharat আর Bhashini এই দুটি প্রজেক্টের কথায়।

BHASHINI হল ভারতের একটি জাতীয় ভাষা অনুবাদ মিশন, যা অও ও ঘখচ ব্যবহার করে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সহজ অনুবাদ, স্পিচ রেকগনিশন, এবং তথ্যের বহুভাষিক প্রবাহ নিশ্চিত করে। এটি ডিজিটাল ভারতের অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছে, যাতে ভারতীয় নাগরিকরা তাদের ভাষায় ডিজিটাল সার্ভিস এবং ইনফর্মেশন সহজে পেতে পারে।

অন্যদিকে ইযধংযরহর প্ল্যাটফর্ম হল সরকার, শিল্প এবং স্টার্ট-আপদের জন্য একটি ওপেন সোর্স, যা ভাষা ডেটাসেট ও মডেল সরবরাহ করে। তা ছাড়া, নাগরিকদের ভাষা সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহের জন্য "Bhasha Daan" নামে একটি ক্রাউডসোর্সিং উদ্যোগ চালু করেছে। এর ফলে ভাষার বাধা দূর করে জাতীয় ডিজিটাল ইনক্লুশন বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, ইযধংযরহর ভারতীয় ভাষায় সরকারি ওয়েবসাইট, পোর্টাল, চ্যাটবট এবং ট্রান্সলেশন সার্ভিস তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়া, AI4Bharat হলো IIT Madras-এর একটি গবেষণা কেন্দ্র যা ভারতের ২২টি ভাষার জন্য ওপেন সোর্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) টুলস, ডেটা, মডেল এবং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে। এর লক্ষ্য ভারতীয় ভাষাগুলোর অও প্রযুক্তি ইংরেজির সমতুল্যে উন্নত করা এবং ডিজিটাল ইনক্লুশন বাড়ানো। AI4Bharat ভাষা বুঝতে, অনুবাদ, স্বয়ংক্রিয় স্পিচ রেকগনিশন ও স্পিচ সিন্থেসিসসহ বিভিন্ন অও প্রযুক্তি তৈরিতে কাজ করে। এটি ভারতীয় ভাষাভাষীদের জন্য প্রযুক্তি সহজলভ্য করে তুলছে এবং গবেষণা ও শিল্পে অবদান রাখছে।

দুটি প্রজেক্টেই একে অপরের সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে। এই প্রজেক্টের আউটপুট মাইক্রোসফট যুগলবন্দী প্ল্যাটফর্ম, Open NyAI সিটিজেন সার্ভিস, ব-Shram, Defence Production I e-Gram Swaraj প্লাটফর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মহা কুম্ভ ২০২৫: BHASHINI প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অও-চালিত মাল্টিলিঙ্গুয়াল ভয়েস চ্যাটবট Kumbh Sah'AI'yak চালু করা হয়েছে, যা মানুষের তথ্য ও নেভিগেশনে সাহায্য করেছে।

তবে এ হল টিপ অফ দ্যা আইসবার্গ। আরো অনেক কিছুই হতে চলেছে যা সারা পৃথিবীর মাথা ঘুরিয়ে দেবে। পরিশেষে আরও একটা কথা বলে যাই।

মাদ্রাস আইআইটির মিতেশ খাপরা এই দুটি প্রজেক্টের সাথে প্রথম থেকেই জড়িয়ে এবং অও৪ইযধৎধঃ এর অন্যতম উদ্যোক্তা। মিতেশ তাঁর এই কর্মকান্ডের জন্যে ২০২৫ সালে TIME ম্যাগাজিনের "১০০ Most Influential People in AI" তালিকায় স্থান পেয়েছেন, যেখানে এলন মাস্ক, স্যাম অল্টম্যানের মত বড় বড় নামের সঙ্গেও তিনিও রয়েছেন।

ভারত এগোচ্ছে। ডিফেন্স টেক, ডিজিটাল ইনক্লিউশন, সফটওয়ার প্ল্যাটফর্ম, স্পেস রিসার্চ.... সবেতেই। কিন্তু নিজের মত করে, নিজের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে, কারুর কপি পেস্ট করে নয়। আর এটাই সবথেকে আশার, সবথেকে আনন্দের বিষয়!

সফটওয়্যার উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ এবং ফটোগ্রাফার। প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, সোম ইমেজিং ইনফর্মেটিকস

পঞ্চম বিশ্বপতি মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা

বাংলায় চিকিৎসা বিদ্যা চালু হল

শেখ জিন্নাত আলি

'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা) পরিচালিত ৩৮-তম 'সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস কোর্সের শেষ পর্বে গত ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫, 'পঞ্চম অধ্যাপক বিশ্বপতি মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা, ২০২৫-২৬' উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী শিক্ষা প্রাঙ্গণে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিয় অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্যে অনুষ্ঠানের মুল সুরটি বেঁধে দেন সংবাদ জগতের প্রিয় মানুষ শ্রী প্রশান্ত কুমার বসু, যিনি ইসনা পরিচালিত সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস কোর্স কমিটির চেয়ারম্যানও। শ্রী বসু সংস্থার ইতিহাস ও বর্তমান কর্মসূচী সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা ও অন্যান্য দিকগুলির গুরুত্ব সাবলীল ভাবে তুলে ধরেন।

পরবর্তী পর্বে স্মারক বক্তৃতা - "বাংলা ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষার বিবর্তন(১৮২২-১৯১৬)"- শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার আগে বিশিষ্ট ক্যানসার চিকিৎসক, গায়ক, লেখক ও বিজ্ঞান সম্প্রচারক, ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথের সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন বিজ্ঞানী ও ইসনার অবৈতনিক সচিব, ডঃ অমিত কৃষ্ণ দে। তিনি প্রধান অতিথি, ডঃ নাথের বিশাল কর্ম জগতে চিকিৎসা, সঙ্গীত, প্রকাশনা, ও অঙ্কন সহ ওঁর বিস্তৃত এবং বহুমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করেন।

এর পরে অনুষ্ঠানের মুল আকর্ষণ ছিলেন ডাঃ নাথ। একজন বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। আবার একই সঙ্গে তিনি একজন মনোগ্রাহী বক্তাও। 'বাংলা ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষার বিবর্তন (১৮২২-১৯১৬)' প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে তিনি ছবি সহযোগে প্রাচীন কলকাতার বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস তুলে ধরেন। সেই সময়ে চিকিৎসা বিদ্যার কি ভাবে শুরু হল, কিভাবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের অনুমোদন পেল, এ ব্যাপারে সরকারি এবং বেসরকারি প্রচেষ্টাই বা কি ছিল, ছাত্র সমাজই বা কি ভুমিকা পালন করেছিল তা তিনি বিষদভাবে তুলে ধরেন। তদানীন্তন ছাত্র এবং পরবর্তী কালে বিশিষ্ট চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্তের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত,

>>৮

শুভাংশু শুক্লা ইতিহাস গড়লেন

পাতা ৬ এর পর>>

রাজদীপ দে

এই মিশনের উদ্দেশ্য শুধু গবেষণাই ছিল না, বরং মহাকাশে মানুষের টিকে থাকার প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

সংগ্রহও অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে ছিল। শুভাংশু শুক্লা ওঝঝ-এ থাকাকালীন কিছু জটিল জৈব-চিকিৎসা ও পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, যার ফলাফল ভবিষ্যতের চন্দ

ও মঙ্গল মিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

এই ঐতিহাসিক যাত্রা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মহাকাশবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আগ্রহী করে তুলবে এবং ভারতের তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞানমনস্কতা ও কৌতূহলকে জাগ্রত করবে বলে আশা করা যায়। এই অভিযানটি প্রমাণ করে দিল যে, ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। শুভাংশুর যাত্রা প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে ছিল এক গর্বের মুহূর্ত৩ তিনি শুধু মহাকাশে পাড়ি দেননি, নিয়ে গিয়েছিলেন এক জাতির স্বপ্ন।

বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ
সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

রঞ্জন রশ্মি কথা

পাতা ৬ এর পর>>

মালবিকা সেনগুপ্ত

এক্স-রে মেশিন বানালেন ও সর্বসমক্ষে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন।

এই নিয়ে ১৮৯৮ সালে তাঁর প্রাণের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি চিঠি লেখেন।

অমৃত বাজার পত্রিকায়

"চৎড়ভবংংড়ৎ ইড়ংব ধহফ ঃযব ঘবঁ খরমযঃ "এই শিরোনামে খবরটি ছাপা হয়েছিল। ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় আর্ল অফ এলগিন-এর করতলের এক্স-রে করা হয়েছিল।

আবিষ্কারের প্রথম দিকে রে-কে বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করা হচ্ছিলো। ধীরে ধীরে চিকিৎসা জগতে এক্স-রের গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করতে পারলেন। কলকাতা শহরের তৎকালীন প্রথিতযশা ডাক্তার ড. কার্তিক বসু প্রথম এই এক্স-রেকে ক্লিনিকাল গুরুত্ব দেন ও ব্যবহার করেন।

ভারতের সর্বপ্রথম এক্স-রে মেশিনও কলকাতায় প্রস্তুত হয়েছিল। বিভুবিলাস ভৌমিক প্রথম এক্স-রে মেশিন তৈরী করেন। তিনি নিজে "জধফড়হ ঐড়ঁংব " নির্মাণ করেন ও দেশজ ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম ব্যবহার করেন।

এই সকল দিকপাল মানুষদের অধ্যবসায়, উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফলে কলকাতা শহরের অতীতও গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছিল।

সদস্য, অরগ্যানাইজিং কমিটি, ইসনা

খড়ের সংকট: গরু খাবে কি?

পাতা ৪ এর পর>>

মহম্মদ আসিফ

তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাদের মতে, কৃষকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধান উৎপাদন, খড় নয়।

অনেকের অনুমান হারভেস্টার মেশিন মূলত বিদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি, যেখানে খড়ের প্রয়োজন নেই

বললেই চলে। ফলে খড় সংরক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদের মত, যদি এই প্রযুক্তি ভারতের কৃষি-পরিস্থিতি মাথায় রেখে তৈরি হতো, তাহলে ধান কাটা যেত খড় নষ্ট না করে। বহুজাতিক সংস্থার অন্ধ অনুসরণ ও দেশীয় প্রয়োজন উপেক্ষা করার ফলেই আজকের এই খড়-সংকটের সূত্রপাত।

সম্পাদক, জবর খবর, বর্ধমান

মুজঃ দশাসই এক অদ্ভুত প্রাণী

সৌমিত্র চৌধুরী

বিশাল আকারের এক জন্তু। নাম শুনিনি আগে। দেখিওনি। দেখলাম হোয়াইট মাউন্টেন ন্যাশনাল ফরেস্টে (White Mountain National Forest (WMNF)। প্রাণীটির নাম মুজ (গড়ড়ংব).

ভিন্ন দেশের অদ্ভুত দর্শন, দশাসই এক প্রাণী। আমেরিকার অরণ্য ঘেরা পাহাড়ে দেখতে পেলাম। আমাদের দেশ ভারত প্রাণী বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু ভারতের কোথাও মুজ নামের প্রাণীর সন্ধান মেলে না। আমেরিকার নিউ হ্যামশায়ার (New Hampshire) রাজ্যে বেড়াতে গিয়ে চতুস্পদ বিশাল আকারের প্রাণীটি দেখলাম। নিউ হ্যামশায়ার রাজ্যের বিশাল অরণ্য, হোয়াইট মাউন্টেন ন্যাশনাল ফরেস্ট। মাউন্টেন যে খুব উঁচু তা নয়, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ চার হাজার ফুট। পাহাড়গুলোরও অনেক নাম। ক্যানন মাউন্টেন (Cannon Mountain), কিন্সম্যান মাউন্টেন (Kinsman Mountain), মাউন্টেন মুসিলক (Mountain Moosilauke). পাহাড় অনুচ্চ হলেও ফরেস্ট কিন্তু আয়তনে খুব বড়, বারোশো বর্গ মাইলেরও বেশী। হোয়াইট মাউন্টেন অরণ্যের কিছু অংশ অবশ্য 'মেইন' নামের অন্য আরেকটি রাজ্যের অন্তর্গত। হোয়াইট মাউন্টেন পাহাড়ের অবস্থান আমেরিকার উত্তর পূর্ব দিকে।

পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলবার ঢেউ খেলানো মসৃণ পথ। দুপাশে ঘন অরণ্য। অক্টোবর মাস থেকে শুরু হয়ে যায় শরৎকাল, ওদের ভাষায় 'ফল (Fall).' গাছের পাতা ঝরার মরসুম। ম্যাপেল গাছে রঙ লাগে। সবুজ থেকে হলুদ তারপর লাল পাতা। শীত ঋতুর আগে অনবদ্য লাল রঙে সেজে থাকে পাহাড়, অরণ্য। তখন চলার পথের দুই

জঙ্গলে মুজ (সংগৃহীত ছবি)

ধারে শুধুই লাল রঙ। শুধু মাত্র 'ফল কালার' দেখতেও প্রচুর ভ্রমণকারী আসেন এখানে।

পাহাড় জঙ্গলে গাড়ি চলবার রাস্তা যেমন আছে, তেমনই আছে হেঁটে বেড়াবার পথ (hiking trail)। আছে জঙ্গলের ভিতর ক্যাম্প করে থাকবার ব্যবস্থা। পাহাড় জুড়ে আছে বহু প্রাণী। যেমন ভাল্লুক, র‍্যাকুন, হরিণ, এবং মুজ।

মুজ নামের প্রাণীটি বেশ অদ্ভুত রকম। দেখতে বাইসনের মত। শরীরের গঠন দেখে তেমনই মনে হয়। বাইসনের মতই বলিষ্ঠ। পায়ে সাদা লোম, মনে হয় যেন সাদা মোজা। কিন্তু মাথার দিকটা অন্য রকম। মাথার উপর শিং। তাও আবার গাছের ডালের মত (twig-like).

আমাদের দেশে অনেক ধরনের হরিণের মাথায় দেখা যায় গাছের ডালের মত শিং (antlers)। চিতল, বারশিঙ্গা, সম্বর এই ধরণের হরিণ। মুজ নামের প্রাণীটির মাথায়ও বারশিঙ্গা হরিণের মত বড় শিং। তাহলে কোন ধরণের প্রাণী এই মুজ? হরিণ না বাইসন!

দুই জন্তুর মিশ্রন, এমন প্রাণী অনেক দেখেছি। ভুটান পাহাড়ের টাকিন নামের প্রাণীটি যেমন। ভেড়া আর পাহাড়ি গরুর সংমিশ্রণ। মিথুন নামের এক চারপেয়ে প্রাণী দেখেছি অরুণাচল প্রদেশে। স্থানীয় ভাষায় নাম গয়াল (Gayal). প্রাণীটি পোষ মানে, সেটি গরু কিন্তু দেখতে বাইসনের মত।

আর আমেরিকায় দেখা মুজ নামের প্রাণীটি? মাথার দিকে তাকালে মনে হয় সম্বর হরিণ। কিন্তু শরীরটা তো বাইসনের মত। প্রাণীটি যেন হরিণ আর বাইসনের সংমিশ্রণ। একে বাইসন বলবো না হরিণ? ভাবনাচিন্তা, গবেষণা হয়েছে বিস্তর। বিজ্ঞানের বিচারে সনাক্ত হয়েছে মুজ নামের প্রাণীটি হরিণ পরিবারের। চার থেকে সাত ফুট উঁচু। ছোট্ট লেজ (৬ থেকে ৮ সেমি) আছে। ওজনে ছয়-সাতশো কেজি। স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে ওজন, উচ্চতার পার্থক্য আছে। আর দেশ ভেদে প্রাণীটি ভিন্ন আকারের। আলাস্কার মুজ আকারে সব চাইতে বড়। দল বেঁধে নয়, একা থাকা পছন্দ করে প্রাণীটি। গাছের ডাল পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। এমনিতে শান্ত, তবে প্রয়োজনে ভীষণ আক্রমণাত্মক।

উপজাতীয় মানুষ প্রাণীটি শিকার করতো। সে অনেক দিন আগের কথা। এখন প্রায় সব দেশেই আইন করে শিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিকার নিষিদ্ধ, তাই কমে যাওয়া প্রাণীটিও সংখ্যায় বাড়ছে। অনেক দেশে লোকালয়েও চলে আসে ইদানিং।

অদ্ভুত দর্শন প্রাণীটি দেখে অবাক হয়েছি বিস্তর। ইচ্ছে হল বন্ধু সহকর্মীদের জানাই। তাই এই লেখা। আমেরিকার হোয়াইট মাউন্টেন ন্যাশনাল ফরেস্টের মিউজিয়ামে রাখা প্রাণীটির ছবিও দিলাম।

পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান ও এমেরিটাস মেডিক্যাল স্যায়েন্টিস্ট, চিত্তরঞ্জন জাতীয় কর্কট রোগ গবেষণা সংস্থাণ, কলকাতা

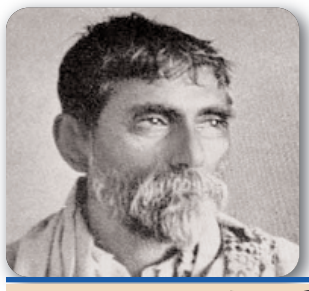

বিজ্ঞান কহন

কলকাতা ডিসেম্বর ১১, ২০২৫ বৃহস্পতিবার, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ইতিহাসের বিজ্ঞান না বিজ্ঞানের ইতিহাস?

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

যে বইটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব, তা একটি অনুবাদমূলক বিজ্ঞান সাহিত্য। বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক জে. ডি বার্নালের 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি' বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন আশীষ লাহিড়ী। এই বিখ্যাত বইটি বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, আনন্দ পাবলিশার্স। বইটি হয়তো অনেকেই পড়েছেন, অনেকের সংগ্রহেও রয়েছে। তবু বিজ্ঞান কহনের নতুন পাঠকদের কথা মাথায় রেখে এই বইয়ের পর্যালোচনাটি করলাম।

আইরিশ কৃষিব্যবসায়ী পিতা এবং মার্কিন সাংবাদিক মাতার পুত্র জন ডেসমন্ড বার্নাল বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সমাজভাবনায় ইতিহাসে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। নানা বিষয়েই তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তার লেখা এই বইটি সত্যিই এক আশ্চর্য গ্রন্থ। বিজ্ঞানের উদ্ভব কীভাবে হল, সমাজের ওপর তার অভিঘাত কীভাবে পড়েছে, তার এক মনোমুগ্ধকর সুসংহত চিত্র এই বইতে অঙ্কিত হয়েছে।

এই বইয়ের অনুবাদের শুরুতেই আশীষ লাহিড়ী লিখেছেন- সেই হাতে গড়া পাথরের কুঠারের যুগ থেকে শুরু করে আজকের এই হাইড্রোজেন বোমা আর জিন প্রযুক্তির যুগ পর্যন্ত সমাজ আর বিজ্ঞান কিভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে চলেছে, তার গতিসূত্রটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন ডেসমন্ড বার্নাল- তাঁর সায়েন্স ইন হিস্ট্রি গ্রন্থে, যা পৃথিবীর অন্তত ১৭টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান বলতে বার্নাল শুধু প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানকেই বোঝাননি। সমাজবিজ্ঞানও তার গবেষণার অন্তর্গত। তিনি দেখিয়েছেন, ধর্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞানে সমস্তই নির্দিষ্ট যুগের, নির্দিষ্ট শ্রেণির চাহিদা অনুযায়ী বিকশিত হয়েছে।বিকাশের পশ্চিম কেন্দ্রীকতার তত্ত্বকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বার্নাল দেখিয়েছেন, ভারতীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, চৈনিক, ইসলামী বিজ্ঞান কীভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের অতুলনীয় সৌধটিকে গড়ে তুলেছে।

সবশেষে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এই এত বড়ো সৌধ যে গড়ে উঠল, মানুষের সমাজ তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার যোগ্য তো? সমাজকে সেই যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে, নইলে মানুষের এত বড়ো সাধনা বিফলে যাবে - এইটিই বিজ্ঞান মনীষী বার্নাল-এর শেষ বার্তা।

গত ৫০ বছর ধরে এই বই সারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে; দেখবার চোখ, বোঝবার মন তৈরি করে দিয়েছে। মানুষের মুক্তি অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। শোনিতে-স্বেদে অবলিপ্ত সেই চির চলমান মুক্তি আন্দোলনে বার্নালের এই নৈবেদ্যটি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, থাকবে।

এই বইটিতে ৮টি পর্ব ও ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানরূপে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ, বিজ্ঞানের ক্রমসঞ্চিত ঐতিহ্য, উৎপাদনের উপকরণ ও বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান: ভাবধারার উৎস, বিজ্ঞান ও সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

দ্বিতীয় পর্বের তিনটি অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে সমাজের উদ্ভব, আদিম জীবনযাত্রার বস্তুগত ভিত্তি, আদিম জীবনযাত্রার সামাজিক ভিত্তি,

যুক্তিশাসিত বিজ্ঞানের উদ্ভব, পরিবেশের রূপান্তরসাধন, সমাজ সংগঠন ও ভাবধারা, আদিম মানবের কর্ম কৃতিত্ব, উৎপাদনশীল অর্থনীতি অভিমুখে, সভ্যতা, সভ্যতার প্রকৌশল সমূহ, পরিমানাত্মক বিজ্ঞানের উৎপত্তি, আদি যুগের বিজ্ঞানের শ্রেণি উৎস, আদি সভ্যতাগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা, সভ্যতার প্রসার, আদি সভ্যতাগুলির উত্তরাধিকার, লৌহযুগীয় জীবনধারার উৎপত্তি, লৌহ যুগের নগর, ফিনিশীয় ও হিব্রুজাতি, গ্রিক সভ্যতা, সূচনা পর্বের গ্রিক বিজ্ঞান, এথেন্সের কর্মকৃতি, আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য, ধ্রুপদী বিজ্ঞানের অবক্ষয় ও রোম, ধ্রুপদী দুনিয়ার উত্তরাধিকার।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে দু'টি অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে সভ্যতার বিকাশ, ধর্মানুশাসনের যুগ, ধর্মানুশাসন ও বিজ্ঞান, গ্রিক বিরোধী প্রতিক্রিয়া, মহম্মদ এবং ইসলামের উদয়, ইসলামী বিজ্ঞান, ইসলামী সংস্কৃতির অবক্ষয়, পশ্চিম ইউরোপের তামস যুগ, সামন্ততন্ত্র, মধ্যযুগে চার্চ, ধর্ম শাস্ত্রীগণ ও মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান, নব নব প্রকৌশল সহযোগে মধ্যযুগীয় অর্থনীতির রূপান্তর, মধ্যযুগের অন্তপর্বের অর্থনীতি, মধ্যযুগের কর্ম কৃতিত্ব।

এরপর চতুর্থ পর্বের একটি অধ্যায় যার মধ্যে রয়েছে, প্রথম পর্ব: রেনেসাঁস (১৪৪০-১৫৪০), শিল্পকলা-প্রকৃতি-চিকিৎসাবিদ্যা, নৌচালন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, দ্বিতীয় পর্ব: (১৫৪০-১৬৫০), সৌরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি, নব দর্শন: বেকন ও দেকার্ত, তৃতীয় পর্ব: (১৬৫০-১৬৯০), নতুন এক বিশ্বছবি, জ্যোতিষ্কলোকের চলনক্রিয়া: নিউটনীয় সংশ্লেষণ, ফিরে দেখা: পুঁজিতন্ত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব।

এরপর পঞ্চম পর্বে দু'টি অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে আঠারো শতকের গোড়া: থমকে দাঁড়ানোর পর্ব (১৬৯০-১৭৬০), বিপ্লবের যুগে বিজ্ঞান (১৭৬০-১৮৩০), ফরাসি বিপ্লব ও বিজ্ঞানে তার অভিঘাত, শিল্প বিপ্লব যুগে বিজ্ঞানের চরিত্র, মধ্য উনিশ শতক, উনিশ শতকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব, উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞান, তাপ ও শক্তি, এনজিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা, তড়িৎ ও চুম্বকক্রিয়া, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ফিরে দেখা।

ষষ্ঠ পর্বে দু'টি অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন ও পরমাণু, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা, নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, সলিড স্টেট পদার্থবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং পদার্থের কাঠামো, বিশ শতকের প্রযুক্তি, রসায়ন শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, যুদ্ধ ও বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ, উত্তরণের যুগে বিজ্ঞান ও তত্ত্বভাবনা, সামাজিক প্রভাব এবং জীববিজ্ঞানের সাড়া, প্রাণ রসায়ন, আণবিক জীববিজ্ঞান, জীবানু বিদ্যা, চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রাণ রসায়ন, কোষতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্ব, সমগ্র জীব এবং তার বিবিধ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, বংশগতি ও বিবর্তন, জীব ও পরিবেশ : ইকোলজি, জীব বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ।

এরপর সপ্তম পর্বে দু'টি অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয় ব্যক্তি ও চরিত্র, সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞানের ইতিহাস, সামন্ততন্ত্রের যুগে সমাজবিজ্ঞান, পুজিতন্ত্রের জন্ম ও সমাজবিজ্ঞান, মনন মুক্তি ও বিপ্লব, উপযোগবাদ ও উদারপন্থী সংস্কার, মার্কসবাদ ও সমাজবিজ্ঞান, শেষ উনিশ ও আদি বিংশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞান, উনবিংশ ও আদি বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদের বিকাশ, বিশ শতকে সমাজ ভাবনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ, শিক্ষা বিজ্ঞান, মতাদর্শগত পটভূমি, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাধীন পৃথিবী অভিমুখে, সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ।

অন্তিম পর্ব, অর্থাৎ অষ্টম পর্বের আরও একটি অধ্যায়, বিজ্ঞান ও সামাজিক শক্তি সমূহ, বিজ্ঞানে প্রকৌশলে ও অর্থনীতিতে উন্নতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথরেখা, শ্রেণী সমাজে বিজ্ঞান, আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ধ্যান ও কর্ম, বিজ্ঞানের সংগঠন ও বিজ্ঞানের স্বাধীনতা, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিজ্ঞান, বিশ্বের প্রয়োজনে বিজ্ঞান।

শুধু মাত্র বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবেই বইটি অসাধারণ। কিন্তু এটি নিছক বিজ্ঞানের ইতিহাসের গণ্ডিকে ছাপিয়ে গেছে। সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে লেখক যে মুনশিয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন এবং অনুবাদক তা যথাযথভাবে বাংলা ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অবাক করে।

বইটিতে অনুবাদক ভাষা, বানান এবং লেখনীর সাবলীলতা সম্পর্কে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়েছেন। প্রকাশক প্রচ্ছদ, বাঁধাই, ছাপা ও পাতার মানের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান। বইটির গুনগত মানের তুলনায় দাম যথাযথ।

(ইতিহাসের বিজ্ঞান।। জে. ডি. বার্নাল।। অনুবাদক আশীষ লাহিড়ী।। আনন্দ পাবলিশার্স।। মে, ২০১৫।। দাম ৬০০ টাকা।)

যুগ্ম সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন

বাংলায় চিকিৎসা বিদ্যা চালু হল

শেখ জিন্নাত আলি

পাতা ৭ এর পর>>

ডঃ নাথের আঁকা ভারতের প্রথম শব ব্যবচ্ছেদকারী চিকিৎসক ডঃ মধুসূদন গুপ্তের একটি প্রতিকৃতি এখনও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের লেকচার থিয়েটারে ঝোলানো রয়েছে।

এরপর, প্রধান অতিথির হাতে অধ্যাপক বিশ্বপতি মুখার্জি স্মারক উপহার তুলে দেন ইসনার সভাপতি, অধ্যাপক বিকাশ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, তখনকার সময়ে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় চিকিৎসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের পিছনে যে আন্তরিকতা এবং তৎপরতা ছিল আজকের যুগে তা একেবারেই নেই বললেই চলে।

শুরু হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব। দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং ইসনার কোষাধক্ষ্য, অধ্যাপক প্রবীর কুমার সাহা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ৩৮তম সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস কোর্সের অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য, সেখ জিন্নাত আলি।

অনুষ্ঠানটি শেষ হয় প্রধান অতিথি ডাঃ নাথের সুমধুর কণ্ঠে পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত "শুধু তোমার বাণী নয়গো....." দিয়ে। এই 'বাণী'র রেশ তখন যেন ছড়িয়ে পড়ছিল প্রেক্ষাগৃহের এক কোন থেকে আর এক কোনে। হয়তো বাইরেও.....

প্রাক্তন ছাত্র, ইসনা

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: সুকল্যাণ গাইন

সদস্য:
ড. বিকাশ চক্রবর্তী, ড. সুধেন্দু মণ্ডল, ড. মানস চক্রবর্তী, ড. বরুণ চ্যাটার্জি, ড. শ্যামল চক্রবর্তী, ড. অমিত কৃষ্ণ দে, ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. মানসপ্রতিম দাস, ড. শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ, ড. মীনাক্ষী দে, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত, ড. কালিপ্রসন্ন ধাড়া ও ড. আশিস দাস

সম্পাদনা-সহকারী
মালবিকা সেনগুপ্ত, অর্পিতা চক্রবর্তী, তুহিন সাজ্জাদ শেখ, এষা পণ্ডিত, শেখ জিন্নাত আলি, অনির্বাণ দে, সৈকত কুমার বসু, রিজওয়ানা পারভীন, শেফালিকা ঘোষ সমাদ্দার, কৃষ্ণেন্দু রথ

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত ও তনুশ্রী দে

৩৭ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেলঃ isnatraining@gmail.com
website: www.scienceandculture-isna.org

© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA